॥ এই পড়া ॥

॥ সরোজ আচার্য ॥



১৪৩বি, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা—২

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬২
প্রকাশক—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
১৪৫বি সাউথ সিঁথি রোড
কলিকাতা—২
মুদ্রাকর—শ্রীহেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিণ্টার্স
৪-এ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
পূর্ণেন্দু পত্রী
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
বাঁধাই—দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১০১ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯
বিক্রয় কেন্দ্র—পুথিঘর
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

বিষয় সূচী

এই লেখকের লেখা

মার্কসীয় দর্শন

মার্কসীয় যুক্তি বিজ্ঞান

বই পড়া

বই ত' পড়ার জন্যেই; কিন্তু কেন পড়ি, কোন্ বই পড়ি আর কোন্ বই পড়া উচিত অথবা উচিত নয়, এ নিয়ে ভাববার সময় কৈ? পড়াটা আমাদের নেশা এবং পেশাও, আর তার স্থরু ছেলেবেলা থেকে যখন "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"। বই পড়া ছাড়া আর কোন্ কাজটা আমরা ভাল ভাবে করতে পেরেছি বা করতে পারি? সমস্ত অক্ষমতা, ব্যর্থতার মধ্যে আমাদের অনেকের ঐ ত একটুখানি সান্ত্বনা—বই পড়তে ভালবাসি, পড়ে কিছু কিছু বুঝতে পারি অথবা না বুঝেও বোঝার ভান করতে পারি। বই যারা পড়তে পারে না তাদের উপরে আমাদের অসীম অনুকম্পা, আর যারা পড়তে পারলেও পড়ে না তারা ত আমাদের চোখে বর্বর। বই যারা পড়তে পারলেও পড়ে না তাদের অনেকেই আমাদের মুরুব্বী, অভাজনদের ত্রাণকর্তা। আমরা বই পড়ুয়ারা বই না-পড়ুয়াদের কী চোখে দেখি? অশ্রদ্ধার? না ঈর্ষার? মাঝে মাঝে মনে হয় বই পড়ার চেয়ে "এয়ারকণ্ডিশন্‌ড" কোচে শরীর এলিয়ে দিয়ে মনের সঙ্গে কানামাছি খেলা অনেক সুখের। অথবা সেই ইংরাজ কবির তীক্ষ্ণ শ্লেষটুকু বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মনকে লুব্ধ করে। কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করতে করতে কবি হয়রাণ হয়েছেন, কাব্য ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে রওনা হয়েছেন, মনকে আশ্বাস দিচ্ছেন, এখন ত আরো সুখ—শুধু কবিতা নয় কবিকে শুদ্ধ কিনতে পারব। ভাগ্যমন্ত বই না-পড়ুয়াদের সুখ অনেকটা ঐ ধরণের। তাই মাঝে মাঝে ঈর্ষা হয়।

তবু বই আমরা পড়বই। ঐটুকুই আমাদের সম্বল এবং সান্ত্বনা। আর সব জায়গায় হার মান্‌লেও ঐখানে হার মানবো না। অন্য নানা দেশের বই পড়ুয়াদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে লাভ নেই। তারা অনেকেই বই পড়ে নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কতকটা অবসর কাটাবার জন্য, কতকটা মনকে, বুদ্ধিকে তাজা রাখবার জন্যও। পড়াটা তাদের নেশা এবং অতি উৎকৃষ্ট নেশা। আমরাও অন্য কোন কাজ পারি বা না পারি কত বই পড়েছি বা পড়ি তা নিয়ে কিছুটা আত্মগর্ব অনুভব করি। সেই গর্ব একেবারে অন্যায্য নয়—অন্তত সিনেমার নেশার চেয়ে বই-এর নেশা অনেক ভালো; খবরের কাগজেব লোমহর্ষক বিভ্রান্তকারী হেড্‌লাইনের অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে আগাথা খৃষ্টি—এমন কি শশধর দত্তেব সঙ্গেও ২।২ ঘণ্টা রহস্য শিকার করা অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর।

বই কেন পড়ি তার জবাব দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। পড়ার অভ্যাসটা আগে, তার তাত্বিক ব্যাখ্যা পরের ব্যাপার—না পেলেও কোনো ক্ষতি হয় না। যদি বলি বই পড়ি, কারণ বার্ণার্ডশ এর বৃদ্ধের ভাষায় For me not to understand means to perish মূঢ়তাই মৃত্যু—সেইজন্যই বই পড়ে মূঢ়তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই, তা হলে বই পড়ার একটার গুরু গম্ভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা হয়ত দেওয়া হবে কিন্তু পুরোপুরি সত্য কথা বলা হবে না। আমরা সব বইও ওরকম কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ি না, অন্তত পরম প্রবীণত্বে প্রমোশন পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের বই পড়ার পেছনে অমন কোনো ছাপ-মারা পরিকল্পনা থাকে না। বই ত এক নয়, বহু—রাস্তায় যেমন অজস্র লোক, এক এক জনের এক এক রকম চেহারা, পোষাক, চলাফেরা—অথচ সবাই মনুষ্য জাতিভুক্ত তেমনি বই-এর জগতের কত যে অলিগলি, রাজপথ, বাঁকাচোরা রাস্তা তার লেখাজোখা অন্ত নেই। কোন্ বই পড়ব, কেন পড়ব অত ভেবে বই পড়ুয়ারা চলে না। যা ভালো লাগে তাই

পড়ব, কাজে না লাগলেও পড়ব ; আবার যা ভালো লাগে না তাও পড়ি, কাজে লাগতে পারে বলে। কোনো বই অথবা বিশেষ ধরণের বই পড়াটা হয়ত ফ্যাশন হয়েছে, অতএব তা-ও পড়তে হবে। "সিজারের প্রাপ্য সিজারকে চুকিয়ে দেওয়া যাক্" তাই ফ্যাশনের দাবি পূরণ করে না হয় কোনো বই পড়া গেল। কারণ কোনো বই পড়াটাই পুরোপুরি লোকসান নয়। শেষ পর্যন্ত লাভ হ'ল নানা বই পড়ে এবং পাতা উল্টে যেতে যেতে ভালো [illegible] এবং কোন· বই কেন ভালো লাগে তার একটা মোটামুটি ধারণা।

বই পড়া সম্বন্ধে বিজ্ঞজনের প্রসিদ্ধ উপদেশ হ'ল, কতক বই কেবল মাত্র চোখ বুলিয়ে যাবে, কতক পড়বে কিন্তু মনে রাখবে না, আর কতকগুলি মাত্র চিবিয়ে চিবিয়ে হজম করতে হবে। উপদেশটা শুনতে সহজ, কিন্তু কোন্ বই চোখ বুলিয়ে যাবো, কোন্ গুলি হজম করা উচিত হবে, তার হিসাব কি করে ঠিক হবে ? বই-এর অন্ত নেই—কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, রাজনীতি ও অর্থনীতির গ্রন্থ, ধর্ম পুস্তক, এমন আরও কত কি। তারপর পৃথিবী আজ একাত্ম না হলেও একাকার—ভালো বিদেশী বই তা-ও পড়তে হবে, মূল না হলেও অন্তত অনুবাদ।

কবিতা কি পড়া ভালো অথবা খুব ভালো না হলেও কি পড়া দরকার ? কে জানে ? অনেক কবিতার বই পড়েও এর রীতিমত প্রমাণসিদ্ধ কোনও উত্তর পাইনি। তবু মাঝে মাঝে অনেক গদ্যময় পড়া ও দমবন্ধ করা কাজে ঠাসা দিনের ফাঁকে ফাঁকে কবিতার জন্য মন লুব্ধ হয়, বাঁধা লাইনের ভাবনা থেকে মুক্তি চায় ছন্দ ও কল্পনার গতিময়তার মধ্যে ; দিন যায়, বয়স বাড়ে, অভিজ্ঞতার বৃত্ত একটানা একধারায় জীবনের প্রতিস্তরে দাগ কেটে চলে ; ওরি মাঝে মাঝে যদি কোন বই নূতন প্রাণের উজ্জীবন করতে পারে,অভ্যাসের বেড়া ভেঙে স্বচ্ছন্দ বিচরণের প্রেরণা দিতে পারে,তবে সে হ'ল প্রথমেই কবিতার বই। কিন্তু কার কবিতা দেবে প্রেরণা ? সে প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো উত্তর নেই। ভালো লাগা না লাগার

কথা ত সব বই-এর বেলাতেই খাটে। কিন্তু ভালো লাগছে না অতএব বইটা ভালো নয় এটা গায়ের জোরের কথা। রবীন্দ্রনাথের পরেও বাংলায় অনেক কবিতা লেখা হয়েছে। কিছু ভালো লাগছে, কিছু ভালো লাগবার মত এখনও হয়নি। কারো কারো মতে হয়ত রবীন্দ্রনাথের পর ভালো কবিতা লেখাই হয়নি। এটা তাত্ত্বিক বিচার, সাধারণ বই পড়ুয়ার মত নয়।

সাধারণ পাঠক, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ভাষায় বলতে গেলে, এক হিসেবে অসাধারণ। তার কোনো বাঁধাধরা মতের বালাই নেই। সে বই পড়তে ভালোবাসে, হয়ত কবিতাও ভালবাসে; সে পড়ে বিস্ময়ের সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে, সমালোচকের কষ্টি পাথর তার হাতে নেই। সে নির্ভর করে তার অনুভূতির উপরে, আরো পাঁচখানা বই পড়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সে তার ভালো লাগা না লাগার কারণ খোঁজে। এই হল খাঁটি বই-পড়ুয়া। পাঠকের শ্রেণীতে এদের স্থান সব শেষের বেঞ্চে, তবু এরাই দলে ভারী।

ভালো বই মানেই কোন বিশেষ একটা মত বা ভঙ্গীর পরিপোষক বই একথা মান্‌তে উৎসাহ পাওয়া যায় না। কোনো বিশেষ মত বা ভঙ্গীর পরিপোষক হলেই বই ভালো লাগা উচিত, ভালো লাগ্‌বে, এটা মিথ্যাই আশা করা হবে। অভ্যাস ও সংস্কারের চাপে কোনো বই-পড়ুয়া হয়ত ধর্মগ্রন্থই একমাত্র ভালো বই মনে করে। কেবল-মাত্র বিশেষ ধরণের বইকে ভালো বলা ভালো লাগাতে চেষ্টা করা, ঐরকমই সংস্কারের দাসত্ব, মূঢ়তার কাছে পরাজয়।

বই পড়ায় রুচিভেদ অবশ্যই আছে। এক রকম বই-পড়ুয়া আছেন, যাঁরা পুরানোর ভক্ত, নতুন লেখকের লেখা দু চক্ষে দেখতে পারেন না। আবার অতি উৎসাহী আধুনিক বই পড়ুয়ার সংখ্যাও আজকাল কম নয়—তাঁদের কাছে কোনো আধুনিক বই হয়ত অনন্যসাধারণ, পুরোনো কালের বই-এর মধ্যে তার জুড়ি মেলে না। এমন পাঠকও দেখা যায়, যাঁরা নির্বিচারে সবই পড়েন, আধুনিক এবং পুরানো, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ভালোমন্দ সবরকমই,

এঁরা হলেন জাত-পড়ুয়া। হাঁসের পাখায় যেমন জল দাঁড়ায় না তেমনি এঁদের মনেও কোনো বই দাগ কাটতে পারে না। পড়বার আনন্দ বা অভ্যাসই এঁদের বই পড়ার আদি এবং অন্ত।

বই-পড়ায় এই অবারিত, নির্বিচার উৎসাহ আসলে হয়ত ভালই। পরীক্ষার জন্য অথবা কোনো কাজের জন্য বই পড়ার একটা নির্দিষ্ট রীতি থাকবেই। খাঁটি বই-পড়া কিন্তু এরকম কোনো বাঁধা ধরা উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তা হলে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি বই অচল হ'ত। বই লেখা এবং পড়া দুই-ই বৃষ্টির মত সহস্র-ধারা—সেই সহস্র ধারায় কোথয়াও বন্যা এল, কোথায়ও বা জমি ভিজল না আর কোথাও বা ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলার সুযোগ হ'ল। জীবনটা বই দিয়ে ঘেরা নয় ঠিকই; তবে জীবনকে বুঝতে হলে, অভ্যাসের, সংস্কারের বেড়া ভাঙতে হলে বই চাই, আরো বই চাই, সব রকমের এবং আরো বই পড়া চাই।

১৩৬০

চেনা রবীন্দ্রনাথ

অনেক দিন আগের কথা, কোন এক সাহিত্যানুরাগী বন্ধু বলেছিলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়েই প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছি। কথাটি তাঁর নিজস্ব নয়, বোধ হয় অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছি কিনা বলতে পারি না। তবে শৈশব-কৈশোরে যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের শুরু তখন থেকে রবীন্দ্রনাথও আমাদের কথায় গানে, কল্পনায় মিশে গেছেন। যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথমে চিনেছিলাম তিনি ঋষি, দ্রষ্টা. মহামানব এমন কোন পরিচয় নিয়ে আসেননি। বাংলার জল মাটি, আকাশ বাতাসের মতই তিনি ছিলেন আমাদের কাছে সহজ, অন্তরঙ্গ এবং অনিবার্য। বর্ষার শ্যামল সমারোহ আমরা একবার দেখেছি বাইরে আর একবার তার কল্পরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় —এই দুয়ের মধ্যে কোথায়ও ছেদ কি বিরোধ আছে কখনও ভাবতে পারিনি। সেই প্রথম বিস্ময়ের অপূর্ব অনুভূতি সারাজীবন ধরে রাখা আমাদের হয়তো সম্ভব নয়। অন্ততঃ এখন তো নয়ই। বহুদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আগের মত করে পড়বার বা উপভোগ করবার সময় হয়নি। ঠিক অবসরের অভাবই এর কারণ নয়। বিরাগ বা অশ্রদ্ধাও নিশ্চয়ই নয়। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু তাঁর ঐতিহ্যকে, আমাদের চিত্তলোকে তাঁর উপস্থিতিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন চসার ও

শেক্‌সপীয়র তেমনি আমাদের সাহিত্য এবং জাতীয় সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের স্থান। কিন্তু এ হল ঐতিহাসিক মূল্যবিচার। রবীন্দ্রনাথ কি কেবল গিল্টি-করা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য ? না তাঁর সৃজনীশক্তির দান এখনও আমাদের "জীবনে জীবন যোগ করার" প্রেরণা দেয় ?

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের প্রশ্নের অন্ত নেই—তাঁর কাছ থেকে আমরা কি পেয়েছি, কিভাবে তাঁর মানস-সম্পদ আমরা নিতে পারি ? এই ধরনের প্রশ্ন অনেকের মতে আপত্তিকর এবং অস্বাভাবিকও। তবু স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ণের চেষ্টা মার্কস্‌-লেনিন পড়ার ফল নয়। কালের ধারায় এক যুগের অবিস্মরণীয় প্রতিভা পরের যুগে নতুন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ উদারতার সঙ্গে নিজেও এর যথার্থতা স্বীকার করতেন। টেনিসনের ভিক্টোরীয় আত্মসন্তোষ ও ধ্বনিবহুল কাব্যমাধুরীর প্রতি পরবর্তীকালে যে বিরাগ বিদ্রোহের আকারে দেখা গিয়েছিল তার যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল সমসাময়িক জীবনের স্তরে স্তরে। রবীন্দ্রনাথের ভাববস্তু ও কাব্যরীতির সর্বজনীনতা যাঁরা প্রথম অস্বীকার করেন তাঁরা এসেছিলেন বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর কেন্দ্রচ্যুত এক অংশ থেকে। সম্প্রতি কবি ইয়েটস্‌কে নিয়ে ইংরাজি কাব্যরসিক মহলে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর কাব্য প্রেরণার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন মূল্যবিচার অস্বাভাবিক নয়, নীতিবিগর্হিত বা জাতীয়তা-বিরোধীও নয় তবে সে বিচার সহিষ্ণু, যুক্তিসহ হওয়া চাই। সামাজিক তথ্য বা রাজনীতির তত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রনাথের জাতকুল নির্ণয় করলেই রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল গতিবেগ, তার বহুমুখী আবেদন ও তার সমগ্র রূপটির যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায় না। তা যদি হত তবে মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌সের পক্ষে বালজাকের রস উপভোগ করা সম্ভব হত না, গ্যেটের উদার বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ কল্পনার চাইতে প্রাধান্য পেত তাঁর রাজ-পারিষদ বৃত্তি। আর জন স্টুয়ার্ট মিলের মত হেতুবাদী পণ্ডিত বলতে

পারতেন না, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য থেকেই তিনি হৃদয়বৃত্তির সরসতা ফিরে পেয়েছিলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঈশ্বরবাদ না মেনেও।

আসলে আমরা ভুল করি, সাহিত্য-শিল্পের মূল্যবিচারে সরাসরি কতকগুলি সামাজিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে। এটাও নতুন একরম সংস্কারের দাসত্ব হয়ে পড়ে।

একটা সাধারণ সূত্রকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করলে নিজেদের বিচিত্র আনন্দানুভূতির সমস্ত চিহ্নকে মুছে ফেলে দিতে হয়। বাস্তব-বাদের পরিবর্তে এক অদ্ভুত অবাস্তব আত্ম-প্রতাবণার জাল সৃষ্টি করা হয়। রবীন্দ্রনাথেব অনেক কবিতা ও গান, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ এবং কোন কোন নাটক আমাদেব ভালো লাগে, ভালো লাগা অন্যায় নয়, মনোবিকার নয় এবং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নত হলে তাদেরও ভালো লাগবে, এই কথা বলতে বা স্বীকাব করতে ভয় পাওয়াব কারণ নেই।

আমরা সকলেই কবি বা সাহিত্যিক নই, তবে অনেকেই কবিতা ও সাহিত্যের অনুরাগী অল্পবিস্তর। সেই অনুরাগের নানা রং, কখনও উজ্জ্বল, কখনও মলিন হয় জীবনের পর্বে পর্বে। নানা সমস্যা ও সংকটের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই অনুরাগ কখনও গভীর কখনও বা স্তিমিত—ক্ষীণ স্মৃতির সামগ্রী-মাত্র হয়। রবীন্দ্রনাথকে কেন ভালবাসি এবং ভালবাসা আদৌ উচিত কিনা এমনতর প্রশ্ন ও সংশয়ে আমরা অনেকে জড়িয়ে পড়েছি খুব বেশী দিন নয়। কোনো একটা বিশেষ ভাবনৈতিক দৃষ্টিভূমি থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি কি অভাব আছে সে বিচার করার তাত্ত্বিক মূল্য আছে নিশ্চয়ই। আছে কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শকে নির্বিচারে গ্রহণ করার জন্য, অতীতের দোহাই দিয়ে প্রগতিকে উপহাস করার জন্য স্বার্থসম্পন্ন বক্তিদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্র প্রতিভার সমগ্র রূপটির সঙ্গে সমকালীন চেতনার যোগাযোগ ছিন্ন করা চলে না। সমাজের রূপ বদলায়, মনের গড়ন ও ঝোঁক বদলায়, তবু দুয়েরই উপরে অতীত ও ভবিষ্যতের আবেষ্টন ও ইঙ্গিত নানা বিচিত্র ভাবে কার্যকরী থাকে। আমরা

যে রবীন্দ্রনাথকে চিনেছিলাম, নিজেদের অগোচরেই কথায় ও কল্পনায় তাঁর অনেক কিছু আত্মস্থ করেছিলাম তাঁকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়—না জীবনে, না সাহিত্যে।

সেই অনেক কালের চেনা রবীন্দ্রনাথকে কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েই মনের পটভূমি থেকে মুছে ফেলা যায় না। অনেক দিন রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমা করার সুযোগ পাইনি, তবু ও তাঁর প্রেরণা ও প্রভাব মন থেকে মুছে যায় নি বলেই, এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে। তা'ছাড়া মার্কস্‌বাদের সঙ্গে সুস্থ মানবিকতার কোন মৌলিক বিরোধ নেই, সেজন্যও সমকালীন চেতনার স্পন্দন অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির কবিতায়, স্বদেশ সংগীতে, তাঁর বহু গল্প ও উপন্যাসের জীবন-বোধে, তাঁর অজস্র প্রবন্ধে সামাজিক দায়িত্বের আবেদনে।

আমরা বড় বেশী সমস্যাসচেতন হতে বাধ্য হয়েছি; সেই সব সমস্যার জটিল, সংকটময় রূপ যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, বিচিত্র গুণ সৃষ্টি করছে। "সোনার তরী" অথবা "মানসী"তে সেই রূপ কি গুণের সন্ধান না পেলেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে সার্থকতাহীন হবেন এরকম তত্ত্ব বিচার হাস্যকর মূঢ়তা মাত্র। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যকে আমরা দু-ভাবে দেখতে পারি, এক হল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভূমি থেকে তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যসাধনায় গতি ও প্রকৃতি অনুসন্ধান। পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে তাঁর প্রতিভা বিকাশের যোগসূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে, দেশী ও বিদেশী নানা সংস্কার ও চিন্তাধারা তাঁর সাহিত্যকে কখন কি ভাবে প্রভাবিত করেছে সেও লক্ষ্য করবার বিষয়। আঙ্গিক ও রূপকল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিবর্তনেও রবীন্দ্র প্রতিভার সমগ্রতাকে ঐতিহাসিক উপায়ে পরিচিত করার সাহায্য করতে পারে। অনেকের মতে রবীন্দ্র সাহিত্যে সমস্যা নেই, পূর্বকল্পিত সমাধানই সব; অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, প্রশান্তিই তাঁর প্রধান মনোভঙ্গী। এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকা সম্ভব, রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন কোন পর্ব সম্বন্ধে

হয়তো এই উক্তি অনেক পরিমাণে সত্য এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, নাটক ও লেখা আমাদের মনে এখন গভীর আবেগের সঞ্চার করে না। ইতিহাসের মর্মকথাও এইখানে—অনেক প্রেরণা ও ভাববস্তু কালের ধারায় আবেদন ক্ষমতা হারায়। যে মৌলিক আবেগে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" অথবা "এবার ফিরাও মোরে" এখনও উদ্দীপ্ত, গতিময়তার সঙ্গে আমাদের চেতনার যোগাযোগ ক্ষুণ্ণ হয়নি, কিন্তু "গীতাঞ্জলি" কি "রাজা" বা "ফাল্গুনী"র ধ্বনি ও বর্ণময় ইঙ্গিত যত সূক্ষ্মই হোক না কেন তাকে সমকালীন জীবনবেদের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধতে পারা সম্ভব নয়। তবু এ কথা ঠিক নয় যে রবীন্দ্রনাথ মরমী এবং অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী বলেই তাঁর অনেক লেখার সমকালীন আবেদন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ব্রাউনিং-এরও ছিল ভগবদ্ভক্তি ও অস্বাভাবিক আত্মসন্তোষ। তবু তাঁর কাব্যে সংশয় ও ব্যাকুলতা জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনা কখনও রুক্ষভাবে কখনও অপূর্ব গীতিময় ব্যঞ্জনায় হাজার পাকে জড়ানো জীবনের কল্পরূপ প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিং নন, এ রকম উক্তি আক্ষেপের মত শোনাবে হয়তো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানেই সার্থক, প্রাণধর্মের প্রকাশে সবল ও সুন্দর যেখানে তাঁর আবেগ ও কল্পনা বাস্তব সংবদ্ধ।

আমাদের চেনা রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তব সংবদ্ধতার অপূর্ব কল্পানুভূতি সৃষ্টি করেছেন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় অন্তরঙ্গতায়। মানুষ বদলায়, যুগ বদলায়, মানুষের আবেগ ও চিন্তার বিষয় ও ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, যে জীবন সহজ ছিল হয়তো তা জটিল, সংকটময় হয়ে ওঠে; কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জীবন, যৌবন, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম ও সহযোগিতা—এগুলির মৌলিক প্রেরণা মিথ্যা হয় না। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত মনোভাব ও অলৌকিক প্রতীকবাদ কালচিহ্নিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির রূপকার রবীন্দ্রনাথ সকল কালেই রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন আশা করা যায়।

আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে চিনি, অন্তরঙ্গ মনে করি, তিনি কবি,

তিনি জীবন-রসিক, গভীর জীবন-বোধের উদ্বোধক। কৈশোর থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্র-মানসের যে বিচিত্র বিবর্তন আমরা দেখতে পাই তার মূলসূত্র হল কেবলই এগিয়ে চলা, অভিজ্ঞতাকে, জীবনের মূল্যবোধকে নতুন নতুন পর্বে উন্নীত করা। স্বদেশী আন্দোলনের অন্তিমকাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অনুভূতিপ্রবণতা হয়তো অনেকখানি ছায়াচ্ছন্ন, স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর এই সময়ের সাহিত্য সাধনায় অবাস্তব, অতিপ্রাকৃতের উপরে ঝোঁক প্রবল মনে হয়। কবি যেন এ সময় হয়েছেন একান্তভাবেই আত্মকেন্দ্রিক।

প্রথম বয়সের প্রাণোচ্ছল "প্যাগানিজম" ও পরিণত বয়সের ভাবগূঢ় জীবনবাদ যে সৃজনী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তার সন্ধান রবীন্দ্র-মানসের এই অন্তর্বর্তী যুগে হয়তো সামান্যই পাওয়া যায়। হয়তো ইয়েট্সের প্রভাব এই সময়ে তাঁর উপরে অনেকখানি পড়েছিল। সংকীর্ণ প্রচারধর্মী শস্তরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর "স্বদেশী সমাজ" কল্পনার বিরোধও হয়তো তাঁকে অন্তরাশ্রয়ী করেছিল। অতীত ও অতিপ্রাকৃতের নীহারিকামণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বেশী দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারেননি। জীবন-সত্যকে এড়িয়ে সৃষ্টি কল্পনা করবার মত ঐতিহ্য তাঁর প্রতিভার নয়। জোড়াসাঁকো এবং সদর স্ট্রীটে কবি-প্রতিভার জন্ম। তারপর লৌকিক অভিজ্ঞতার নানা বাঁক বেয়ে যে কবির যাত্রা শুরু হল তাঁর সৃজনী প্রতিভার পীঠভূমি রচিত হয়েছিল শিলাইদহ ও সাজাদপুরে। বাংলার নদনদী ও গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দীপ্ত ও রূপায়িত হল তাঁর প্রকৃতির কাব্যে, গল্পগুচ্ছের অসংখ্য কাহিনীতে। তারও অনেককাল পরে পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথ আবার নতুন করে উদ্বোধন করতে চেষ্টা করেছিলেন সমকালীন জীবন-সত্যের কল্পরূপ। জীবনের একপর্ব থেকে অন্যপর্বে তাঁর এই উত্তরণ, সমকালীন প্রাণ—প্রয়াসকে উদার মানবিকতার দৃষ্টিভূমি থেকে গ্রহণ করার ব্যাকুলতা তাঁকে আমাদের মানসক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টি-কোণ থেকে ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন, শেলীর কবিতার চাইতে তাঁর গদ্যরচনাই ভাবীকালে বেশী সমাদৃত হবে। আর্নল্ডের এই ধারণা সত্য হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই রকম কোনও ভবিষ্যৎবাণী করা দুঃসাহসিক অবিবেচনার কাজ হবে। তবে এ কথা হয়তো বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়বাদী কাব্য সম্পদ কালক্রমে ঐতিহাসিক মূল্য মাত্র বহন করবে অথবা বিশেষ একটি গণ্ডির মধ্যেই তার আবেদন বেঁচে রইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সংগীত, তাঁর প্রকৃতি কাব্য, সুনিপুণ রসোজ্জ্বল অথবা মননশীল, উদার মানবতাবোধপূর্ণ গদ্য রচনা সাহিত্য শিল্পের জীবন্ত নির্দশনরূপে প্রেরণা দেবে।

১৩৫৯

রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব

"পস্টারিটি" তাঁর সম্বন্ধে কি ভাববে এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জল্পনা করেছিলেন ; তাঁর সম্বন্ধে "নতুনকালের মোহমুক্ত ভাষ্য" অন্যরকম হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তা অনুমান করেছিলেন, কিন্তু সে জন্য খুব বিচলিত হননি। 'পস্টারিটির" চেয়ে দুশ্চিন্তা আমাদেরই বেশী। কারণ আমরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, অথচ তাঁর সময়কে উত্তীর্ণ হয়ে যেন "পস্টারিটির" পদধ্বনিও শুনতে পাচ্ছি। "পস্টারিটির" একটা রূপ কল্পনা করে আমরা কখনও উৎসাহিত হচ্ছি, কখনও সন্ত্রস্ত হচ্ছি। আর ভাবছি রবীন্দ্রনাথ কি "পস্টারিটির" পরীক্ষা পার হতে পারবেন ?

রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্বের প্রশ্ন সম্ভবত আশু কৌতূহলের বিষয় নয়। নতুনকালে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে ; ভবিষ্যৎ যে দৃষ্টিতে তাঁকে দেখবে, সে দৃষ্টি আজ আমাদের চোখে নেই। গতানুগতিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি আমরা অনেক করেছি। তার স্বাভাবিক কারণও কতকগুলি আছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আমাদের মানসসম্পদ কতটুকুই বা থাকে ? তবু অনেক সময় আমরা বিস্মৃত হই যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিগুলি এখনও শুধু মাত্র মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের সম্পদ। ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্ররসোপলব্ধির পক্ষে এটা হয়ত বড় বাধা নয়। কিন্তু ঝোঁকটা ব্যক্তিগত অথবা সংকীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে উপলব্ধিও অস্থায়ী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা যে বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগবহুল আনন্দরসের সন্ধানে পেয়েছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ একদিন সেই রসভাণ্ডারের

প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি আত্মস্থ করবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সেই অগণিত মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কী ভাবে পরিচিত করাব এই সমস্যা আজ এবং আগামী কালেরও। রবীন্দ্রনাথের এই নূতন মূল্যায়নের উপর নির্ভর করবে তাঁর স্থায়িত্ব।

আমাদের মনে বর্তমানের সংশয় হ'ল এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যে ভাবে, যতখানি প্রাণবন্ত হয়ে আছেন, রবীন্দ্র ভক্তমণ্ডলী তাঁকে পরবর্তী কালে ঠিক ততখানি জীবন্ত করে রাখতে পারবে কি? সাহিত্য এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাসে মূল্য বিচারের একটী সাধারণ মান আছে, যাকে বলা যায় অবিস্মরণীয়তা। এই অবিস্মরণীয়তার স্থায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এখানে আমরা যে স্থায়িত্বের কথা বলছি সে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা বা মর্যাদার স্থায়িত্ব নয়। ইতিহাস দ্বিধাহীন ভাবেই ঘোষণা করবে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মনীষার এক বিরাট উদ্বোধনের পুরোভাগে ছিলেন; তিনি এক সমৃদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে নবীন ঐশ্বর্যে ভরে দিয়েছেন এবং সৃজনের বহুধারার মধ্য দিয়ে প্রবহমান হয়ে তিনি আমাদের বর্তমান চেতনার মধ্যেও নিজেকে সঞ্চারিত করেছেন। এ সবই সত্য। তবুও পরবর্তীকালে তাঁর স্থান হবে কোথায়, তাঁর সাহিত্যের আবেদন কতখানি গতিময় থাকবে, সে প্রশ্ন অনুত্তর থেকে যায়। এ বিষয়ে আমরা এখন শুধু একটা অস্পষ্ট অনুমান মাত্র করতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের যে উদ্দীপক কল্পনাপ্রবণ অভিজ্ঞতা তারই ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আমরা বড় জোর কতকগুলি সাধারণ অনুমান করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ গুণ-বৈশিষ্ট্য ভাবীকাল ও ভিন্ন মানসকে বিমুগ্ধ করবে, তা কেউই বলতে পারে না সঠিক ভাবে। কবি হিসাবে তাঁর অনেক গুণই নিশ্চয়ই ভাবী কালকে বিমুগ্ধ করতে পারে, মহান মানবিক আবেগ মাত্রেই সেই বাঙ্ময় শক্তি আছে। বর্তমানের

পরিবেশ থেকে সঞ্চারিত আবেগ এবং অনুভূতিকে ভাবীকালের চিত্তলোকে প্রাণস্পন্দনে সজীব করে রাখতে পারে এমন গুণ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও লেখায় নিশ্চয়ই আছে।

এযুগে আমরা কখনও কখনও সাহিত্য ক্ষেত্রে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়েছি, এমন কি সেগুলিকে মেনে নিতে সঙ্কোচবোধ করেছি। সাম্প্রতিক ভাব-সংকটে আমাদের অনেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন নতুন একটি আধ্যাত্মিক সমস্যা। তাঁর পরিপূর্ণতা সর্বজনীনতা সম্পর্কে অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট জিজ্ঞাসায় আমাদের চিন্তাধারা আলোড়িত হয়েছে। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিন আমাদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সংশয়পূর্ণ জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে বিস্ময়কর সাবলীল ভাবে নিজের প্রতিভাকে নূতন নূতন ধারায় প্রকাশ করছিলেন। গদ্য ও পদ্যের রূপরীতি ও ভাবাদর্শে তথাকথিত আধুনিক মনোভঙ্গীর পরীক্ষায় নিজেই তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন, এবং অপূর্ব সার্থকতা দিয়েছিলেন। জীবনের শেষার্ধে নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণ সৃজনক্ষমতা আমাদের অনেককেই বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বহুমুখী প্রতিভার মায়াজাল আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আকাশে সংশয় ও বিদ্রোহের মেঘ জমে উঠছে মাঝে মাঝে। বিশ দশক বা তারই কাছাকাছি সময় থেকে কখনও ক্ষীণ আপত্তির সুরে আবার কখনও বা অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের সে আলোচনা শুরু হয়েছে৷ ই সমস্ত সমালোচনার ভুল, ভ্রান্তি, আতিশয্যকে উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু তবু অস্বীকার করা যায়না যে, শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণ সমাজের এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করার যুক্তিপূর্ণ তাগিদও কিছু পরিমাণে ছিল। সে যুগের বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র প্রমুখদের রবীন্দ্রবিরোধী নকল আধুনিকতার পিছনে আসল প্রেরণা ছিল সামাজিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠা খুবই সহজ এবং তা আমরা হয়েছিও, কখনও অতিরিক্ত স্তুতিবাদে, কখনও অহেতুক নিন্দায়। তার একটি কারণ, এখনও আমরা তাঁর অতি কাছাকাছি রয়েছি। এখনও তিনি আমাদের রক্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং কল্পনায় রোমাঞ্চ এনে দেন। শিল্প-গত সর্বজনীততার যে উচ্চতম শিখরে রবীন্দ্রনাথ আরোহণ করেছিলেন, আগামীকালে বহুযুগের মধ্যেও সেখানে কেউ পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সাহিত্য এবং চিন্তার ক্ষেত্রে, জাতীয় জীবনে যে শ্রেষ্ঠ আসন তিনি লাভ করেছিলেন তাকে কোনও দিনই আমরা আমাদের রবীন্দ্র-প্রেমের প্রধান কারণ বলে মনে করিনি। তাঁর আসনের চেয়ে আবেদনই আমাদের চিত্ত জয় করেছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, একান্ত এবং প্রায় ব্যক্তিগত বললেই চলে। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশ অথবা সৃজনী প্রতিভার কোনও একটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে কখনও সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা যে ভাষায় কথা বলি, যে সব কল্পচিত্র স্মরণ করে আনন্দ পাই, সে সবের অনেকখানি তাঁরই সৃষ্টি।

আমাদের কালের অনেক ভাব, আবেগ, চিন্তা প্রায় তাঁরই আবেগ, ভাবনা ও রূপ অনুভূতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এযুগের আমরা রবীন্দ্রপরিবেশে পরিবেষ্টিত। জানালার ভিতর দিয়ে যখন আমরা বাহির বিশ্বের দিকে তাকাই তখন প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথেরই রূপ, রস, ও রঙের প্রতিফলন দেখতে পাই। অর্থাৎ প্রকৃতির যে মানবিক অনুভূতি সহজ ও গভীর ও কালাতীত তা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন প্রধানত রবীন্দ্র-নাথ। রৌদ্রতপ্ত, দগ্ধতাম্র আকাশে, ঝড়ের প্রচণ্ডতায় অথবা ঝর ঝর বর্ষায় মনে যে স্মৃতি এবং কল্পনা জেগে ওঠে তা আমাদের এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, সময়ের যতই পরিবর্তন হোক, কাল—ধর্মে রসানুভূতির যতই ওঠানামা হোক, জীবন যতই জটিল অথবা সহজ হোক না কেন, প্রকৃতি—পরিবেশের এই সব প্রাথমিক উপাদান

থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং তারই মাধুর্য বর্ণনায় উৎসর্গীকৃত কবিতায় যে আনন্দ তা চিরস্থায়ী হবেই। আমরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের অতিমানবিক রহস্যবাদ অথবা লোকাতীত সুখস্বর্গের কামনাকে হয়ত গ্রহণ করতে পারব না। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিগুলি এই অতিপ্রাকৃত রহস্যবাদের উপর নির্ভরশীল নয়; সেগুলির সহজ মানবিক অনুভূতি ও আবেদন স্থায়িত্ব অর্জন করবেই।

অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছিলেন, কুয়াশাপরিবৃত লণ্ডনের সৌন্দর্য অথবা সূর্যাস্তের রক্তরাগ টার্নার তাঁর ছবিতে না দেখালে কেউ এদিকে ফিরেও তাকাত না। টার্নারই প্রথম ছবির পটে রঙের সমারোহে সেই সৌন্দর্যের জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আমাদের জন্য রবীন্দ্রনাথও ঠিক তাই করেছেন। বাঙলার মাঠঘাট, আকাশ, বাতাস, বনভূমি এবং তার পিঙ্গলবর্ণ নরনারীর জীবনের রূপকে তিনি আবিষ্কার এবং উদ্‌ঘাটন করেছেন। কালের বিচার যতই নূতন হোক না কেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই ঐশ্বর্য মূল্যহীন হবে না কখনও। রবীন্দ্রনাথের "দর্শন" বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক (কোন মহান মানবিক শিল্পীরই দার্শনিক অথবা রাজনৈতিক আনুগত্য মুখ্য প্রশ্ন নয়), যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, যতদিন প্রকৃতিপরিবেশের সঙ্গে তার সক্রিয় যোগাযোগ থাকবে ততদিন জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থায়ী থাকবে।

রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রবীন্দ্র অনুরাগীরা অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় দিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কতকটা অবিচারই করেছেন। তাঁর কর্মময় সুদীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি কবি হিসাবে নিজেকে পরিচিত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর জীবনবোধকে তিনি কোন বিশেষ তত্ত্ববিদ্যার ছকে ফেলে সংকীর্ণ করতে চাননি। মানবপ্রেমিক এবং কবি এই উভয় ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে এগিয়ে গেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ করেছেন। তিরিশ সাল

এবং তার পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রথম যুগের কৃতিত্ব ও খ্যাতিকে পেছনে ফেলে শ্রেষ্ঠতর এবং মহত্তর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

এই শতাব্দীর শুরুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং নাটকে ছিল বাস্তব প্রেরণার তেজস্বী শক্তি এবং জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের বিচিত্র স্বাক্ষর। রবীন্দ্র প্রতিভার পরবর্তী একটি পর্বে অস্পষ্ট রহস্যবাদ তাঁর সৃষ্টিকে সেই প্রাণপূর্ণ মানবতাবোধ থেকে বঞ্চিত এবং আনন্দচ্যুত করে রেখেছিল। তবু এই উদাসীন জীবন-বিবাগী মনোভঙ্গী রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য কখনও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম ভাবসম্পদ তাঁর জীবনের প্রধানত দুইটী পর্বের—প্রথম পর্ব হ'ল যৌবনের আনন্দ ও আবিষ্কার এবং লৌকিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং দ্বিতীয়টী হল পরিণতকালে একটি মহাযুদ্ধের শেষ থেকে অন্যটীর সুরু পর্যন্ত।

রবীন্দ্রসৃষ্টির এই সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনধারা এবং তার পরিণতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের কাজে অতিরিক্ত রবীন্দ্র-ভক্তি কোনও কোন অবস্থায় অন্তবায় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি অনৈতিহাসিকভাবে তত্ত্ব-সূত্র প্রয়োগের ফলে অনেক সময় রবীন্দ্র-নাথের প্রতি বিরূপতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। স্তুতি ও প্রশস্তি একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভালো। অতিকীর্তন ও তার প্রাণহীন পুনরুক্তি অনুভূতিকে অসাড় করে দেয়। ফলে সে রবীন্দ্রসৃষ্টির আবেদনে সাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। অথবা সেটা জীবনের মূল্য সম্পর্কে ধরাবাঁধা একটা মন্ত্রপাঠ হয়ে দাঁড়ায়। এইরকম স্তুতিবাদ ও স্থিতস্বার্থের স্বপক্ষে মন্ত্রপাঠের প্রতিক্রিয়া হ'ল রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব এবং তার সমসাময়িক তাৎপর্য অস্বীকারের জন্য পাল্টা আন্দোলনের সূচনা। একরকম সংকীর্ণতার সঙ্গে আর একরকম সংকীর্ণতার দ্বন্দ্বের ফলে সুস্থ বিচার বুদ্ধি ও রসানুভূতি নিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অতিকীর্তন অথবা নিন্দা ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক সমালোচনা এর কোনটাই বহুবিস্তৃত, শাখাপ্রশাখা সমন্বিত সদা

পরিবর্তনশীল রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল্যানুসন্ধানে সাহায্য করে না। প্রকৃত রবীন্দ্রপ্রেমী এবং অন্ধ রবীন্দ্রমত্তদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য আছে, এটা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অন্ধ রবীন্দ্রমত্তদের আতিশয্যের ফলে উগ্র রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্ম। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই রকম বিরাগ সুনির্দিষ্ট বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ থেকে কখনও জন্মায় নি। রাজনৈতিক আবেগ অথবা অন্তঃসারহীন নকল আধুনিকতার নেশা এই সাংস্কৃতিক বিকার ও বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। আবার রবীন্দ্র-মত্তরাও ভ্রান্তপথে এগিয়েছেন অনেক সময় মূল্য বিচারের কালে মন্ত্রপাঠ করে। বিরাট রবীন্দ্রসৃজনসমুদ্র থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে অভিনব অথচ অবাস্তবকল্পনার মাল্যরচনা করা অসম্ভব কাজ নয় কিন্তু তাতে সর্বাঙ্গীন প্রতিভার সত্য পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। তাতে শুধু এই সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগই সমর্থিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ ধরণের আধ্যাত্মিক পসরার ব্যবসায়ী মাত্র, তিনি ছিলেন শূন্যদিনের অলস গায়ক অথবা বড় জোর তিনি অতি কোমল ভাবপ্রবণ নরনারীর জন্য ঘুমপাড়ানী সাহিত্য সৃষ্টি করে-ছিলেন মাত্র। অন্ধ রবীন্দ্রমত্তরা যদি ভাবীযুগের দরবারে রবীন্দ্র প্রতিভার এই বিকৃত অবাস্তব পরিচয় উপস্থিত করেন তাহলে আমাদের এই অপূর্ব বলিষ্ঠ মানবিক প্রতিভার স্থায়িত্ব বিপন্ন হতে পারে। সেইজন্য গুরুতর দায়িত্ব রবীন্দ্রপ্রেমীদের—তাঁরা মত্ত হবেন না, মন্ত্র পাঠ করবেন না অথবা জ্যামিতির ফর্মূলার জোরে মানবিক শিল্পের সর্বজনীন সত্যকে বাতিল করবেন না।

১৩৫৯

বার্ণার্ড শ-এর সমাজ দর্শন

শ প্রতিভার প্রথম অবিসংবাদিত নিদর্শন হল তাঁর ব্যঙ্গোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত নির্ভীক সমালোচনা। ইংরেজী সাহিত্যের ঐতিহ্যে অবশ্য শেভীয় সমালোচনা হঠাৎ নতুন কোনো ধারার সূচনা করে নি, ইউরোপীয় সাহিত্যেও নয়। পরিহাসনিপুণ ফরাসীদের কাছে শ-এর প্রতিভা বিস্ময়কর মনে হয় নি ; সংস্কার ও সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বুদ্ধির অভিযানে বার্ণার্ড শ মোলিয়েরের, ভলটেয়ারের অনুগামী, অনুকারক যদিও নন। ইংরেজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারায় সুইফ্‌ট্‌, ডিকেন্স, কার্লাইলের সমালোচনামূলক জীবনদর্শনের মধ্যেও শ-এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করে অদ্ভুত ভাবসংঘাতের মধ্য দিয়ে সামাজিক, রাজনীতিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার কৌশল শ-এর অনতিকালপূর্বে স্যামুয়েল বাট্‌লারও প্রয়োগ করে-ছিলেন। বাট্‌লারের কাছে শ-এর ঋণ সর্বজনবিদিত। দুঃসাহসিক চিন্তাধারা প্রচারে শ অসাধারণ কিন্তু অনন্য নন। মার্কস্‌, ভাগ্‌নার, নীট্‌সে এবং ইবসেন থেকে শ প্রতিভার মূলধারাটি প্রেরণা পেয়েছে অনেকখানি। এই ঋণের জন্য আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মূল্যহানি হয়নি অবশ্য। কাহিনী ও ঘটনা বিন্যাস ব্যাপারে সেক্সপীয়রও তাঁর পূর্বগামীদের কাছে ঋণী। শ-এর নিজস্ব কৃতিত্ব হ'ল তাঁর নাটক-গুলিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাহিনী ও সংলাপ সৃষ্টিতে।

হয়ত অনেকের মতে শ-এর নাটকে কাহিনী নেই, ঘটনাসংঘাতও দুর্লভ। অভিযোগ গ্রাহ্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সমস্যামূলক, চিন্তাশ্রয়ী নাটক রচনায় শ ইবসেনকে অতিক্রম করেছিলেন। ইবসেনের

নাটকের সমস্যা নিতান্তই ঘরোয়া, যদিও সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহ, প্রেম, বংশানুক্রম ইত্যাদি সমস্যার নাটকীয় রূপদান ও সমালোচনা দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল। শ-এর ছিল আরো বৃহৎ উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং আরও তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি যে সব কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, বাস্তব ঘটনা হিসেবে হয়ত সেগুলি কখনও অদ্ভুত, অবাস্তব, কখনও বা অত্যন্ত সাময়িক কোনো সমস্যার সঙ্গে জড়িত। তবুও শ-সৃষ্ট নাট্যজগতের প্রাণবস্তু হ'ল বিশ্বসমস্যা আর সে সমস্যার মূলে আছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধ, অসঙ্গতি, প্রতারণা ও আদর্শ প্রীতির ছলনা। অনন্যসাধারণ হচ্ছে শ-এর সত্যভাষণের পদ্ধতি, তাঁর চতুর হাস্যরসাশ্রিত বাচনভঙ্গী ও নানা বিপরীত-কথন, এপিগ্রামের মাধ্যমে অভ্যস্ত চিন্তা ও সংস্কারের জড়ত্বকে আঘাত করার কৌশল।

ইংরেজী সাহিত্যের আসরে শ ছিলেন একেবারে বিদ্রোহী কালাপাহাড়, এরকম ধারণা করা সঙ্গত নয়। অন্ততঃ এখন ত নয়ই। একদা জর্জ বার্ণার্ড শ এর নাটক 'সেনসরের' হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, দর্শক ও শ্রোতাদের ধিক্কার পেয়েছিল। আবার পরবর্তীকালে রক্ষণশীল ইংরেজ সম্প্রদায় পর্যন্ত জর্জ বার্ণার্ড শকে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে, পার্লামেন্টের মতই প্রাচীন ও সম্মানিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। এর কারণ, শ-এর সত্যভাষণে সমাজের কর্তাব্যক্তিরাও অনেকখানি উপকৃত হয়েছেন, আর তাঁর অপূর্ব বাক্যবিন্যাস, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ এবং অতিশয়োক্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীকে আনন্দ দিয়েছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ধনতান্ত্রিক সমাজের মূর্তিমান প্রতিবাদী শ-এর পরাজয়ই ঘটেছে। শ বলেছিলেন, আমার দুর্ভাগ্য হবে সেইদিন যেদিন লোকে আমাকে ক্যান্টারবেরীর বিশপের মত শ্রদ্ধা করবে। সে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য তাঁর জীবনকালেই তিনি দেখে গিয়েছেন।

শ-এর সমাজদর্শন প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরোধী, তাঁর শিল্পরীতি ও প্রবল ব্যক্তিত্বও আকর্ষণীয়। কিন্তু বড়ো প্রতিভাকেও তার নির্দিষ্ট

পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। আমরা অনেক সময়ে লেখককে তাঁর পাঠক ও অনুরাগী গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে দেখি। এতে লেখকের শিল্পাদর্শ বিচারে ভ্রান্তির কারণ হয়। লেখক ও পাঠকের সংযোগ এবং আদান প্রদানেই রস সৃষ্টির বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। জর্জ বার্ণার্ড শ-এর লেখা জনসাধারণের জন্য নয়, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য, একথা বলাই বাহুল্য। যে গ্রামে শ বাস করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেই গ্রামের অধিবাসীরা সহৃদয় বৃদ্ধ শকে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করত, কিন্তু শ-এর লেখা ও চিন্তাধারা তাদের কাছে দুর্বোধ্য, এমন কি অজ্ঞাত ছিল। এর কারণ উদাসীনতা নিশ্চয়ই নয়, নিরক্ষরতা ত নয়ই। শ-এর ভাষাও দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু বিপরীতকথন ও অতিশয়োক্তির মধ্য দিয়ে তিনি যে সব ভাবসংঘাত দেখান তা' সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়েই উপভোগ করা সম্ভব, বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলি অত উল্‌টো পাল্‌টাভাবে বাঁকাচোখে দেখা সাধারণ বুদ্ধির সাধ্যাতীত।

ডিকেন্স, গর্কি, টলস্টয় যেমন অনায়াসে সাধারণ পাঠকের অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন, শ কোনদিনই তা' হতে পারেন নি, চেষ্টাও করেন নি। তাঁর ব্যঙ্গরসে আসক্তিও অনেক সময় মাত্রাধিক, সে'জন্য মূল বক্তব্যকে নাটকে, দীর্ঘ উপক্রমনিকায় নানাভাবে সাজিয়ে তিনি এমন বিভ্রম সৃষ্টি করেন যে সঠিক ইঙ্গিতটি ধরা কঠিন হয়।

তবু একজন রসজ্ঞ সমালোচক বলেছেন, "There is really only one class of people to whom he gets accross. Namely, the unso phisticated They are chiefly found amongst the poorer classes, and it is there that Shaw is better understood than anywhere else."

ফেবিয়ান পুস্তিকাগুলির শ বোধ হয়, সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয় ছিলেন। গত শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজ মধ্যবিত্ত সমাজে 'সভ্য ভব্য নিয়মতান্ত্রিক সোস্যালিজম' প্রচারে শ-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা

উল্লেখযোগ্য। চেস্টারটন হয়ত ঠিকই বলেছেন—বিত্তহীন শ্রেণীর মনে চার্টিস্ট বিদ্রোহের প্রেরণা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল শ এবং সিড্‌নী ওয়েব তা বিনষ্ট করেন। আবার প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন ইংরেজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আদর্শ সংকটের আবর্তে দিশাহীন বোধ করছিল, তখনও জর্জ বার্ণার্ড শ তাদের কাছে নতুন ভাবে সোস্যালিজমের বাণী প্রচারে সফল হয়েছিলেন। গত শতাব্দীর জর্জ বার্ণার্ড শ ছিলেন যুক্তিবাদী, সংশয়পন্থী—প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার যেমন তিনি বিরোধী ছিলেন, তেমনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনও তাঁর সমালোচনার বিষয় ছিল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বার্ণার্ড শ-এর দ্বৈতরূপ। তিনি সোস্যালিস্ট, সেইসঙ্গে আবার সুপারম্যানের উদ্ভবের জন্যও আগ্রহশীল। মানবমুক্তির নতুন এক রকম অধ্যাত্ম-দর্শন রচনা করে যুদ্ধক্লান্ত বৃটেনের বুদ্ধিজীবীদের সংকট ত্রাণ করেছিলেন বার্ণার্ড শ।

'ব্যাক টু মেথুসেলা'র রচয়িতা বার্ণার্ড শ মার্কসের অনুরাগী শ থেকে অনেক দূরে সবে এসেছিলেন, এমন কি ফেবিয়ান শ থেকেও। 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা'র প্রতিপাদ্য হল, 'জীবনসৃজনী-শক্তির' বিবর্তনে উপযুক্ত মানুষ সৃষ্টি হলেই প্রকৃত সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই বক্তব্যের ইঙ্গিত পূর্বেও পাওয়া গিয়েছিল, 'ম্যান য়্যাণ্ড সুপারম্যানের' (১৯০৩ সন) একটি নিবন্ধে। তবে 'ব্যাক টু মেথুসেলার' (১৯২১) অধ্যাত্মবাদই বেশী অর্থপূর্ণ।

শ-এর এই প্রেমহীন বুদ্ধিদীপ্ত স্বর্গরাজ্য জনসাধারণের অগম্য; বাস্তব সমস্যার পীড়ন থেকে মুক্তির জন্য অগণিত সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টার কোনো মূল্যও এই নাটকে স্বীকৃত হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের দুর্গতির স্বরূপ ও সমাধান দেওয়া ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের পিতামহেরই কর্তব্য ছিল। 'ইনটেলিজেন্ট ওম্যানস্ গাইড টু সোস্যালিজম্' প্রণয়ন করে তিনি এই কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই গ্রন্থ লেবার পার্টির মধ্যবিত্ত সমর্থকের সংখ্যা বাড়িয়েছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বার্ণার্ড শ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই চিন্তাগুরু। হলব্রুক জ্যাকসন বলেছেন, 'Bernard Shaw is an apostle to the middle class, as, indeed, he is a product of that class........ As a socialist he invariably appeals to the bourgeois instinct of self-interest.' ট্রাফালগার স্কোয়ারে গণবিক্ষোভের বিপর্যয় (১৮৮৭) দেখে বার্ণার্ড শ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, শাসকশ্রেণীর শুভ বুদ্ধির কাছে সুকৌশলে আবেদন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারকার্য তখনকার সময়ে ইংলণ্ডে খুব চমকপ্রদ বা অপ্রত্যাশিত হয়নি। চমক দিয়েছিল শেভীয় বচনাকৌশল, ধাবালো ভাষায় দুঃসাহসিক ভাবের নাটকীয় ব্যঞ্জনা, নতুবা সেযুগের ইংলণ্ডের হাওয়াতে শ্রেণীবিরোধের উত্তাপ ছিল, সাম্রাজ্যের চিত্রপটে আগুনের ছোঁয়াচ লাগছিল; ফেবিয়ান শ ও সিডনী ওয়েব মার্কসের স্থলে মিল ও জেভনস্‌কে প্রতিষ্ঠা করলে কি হবে, ধনতন্ত্রের ঘড়ির কাঁটা ঘুরছিল মার্কসীয় স্প্রিংএর জোরে।

১৮৮৭—১৮৯৩ সনের মধ্যে ফেবিয়ানরা সাত লক্ষ পুস্তিকা প্রচার করে। এই সময়েই ধনিক-শ্রমিক সংঘাত তীব্র হয়। ফেবিয়ান-দের চোখের সামনেই টম ম্যান ও জন বার্ণসের নেতৃত্বে ১৮৮৯ সনের বিরাট ধর্মঘট সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির সূচনা করে। ১৮৯২- ১৯০৬ সনের মধ্যে কেয়ার হার্ডির নেতৃত্বে যে শ্রমিকদল গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে ফেবিয়ান সোস্যালিজমের যোগাযোগ কিছু পরিমাণে ছিল; কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড-য়্যাটলী-বেভিনের মালিক-মজুর মিতালীর সোস্যালিজম কেয়ার হার্ডিদের কল্পনার অতীত ছিল।

আশ্চর্য নয় মোটেই, এইরকম সময়ে ঘটনা ও চিন্তার সংঘর্ষে অস্কার ওয়াইল্ডের মত সৌখীন বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সোস্যালিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের পরিপূর্ণতা বিষয়ে বই লিখছিলেন। এই অস্কার ওয়াইল্ডের পাশাপাশি মনে করুন এযুগের অলডাস হাক্সলী ও তাঁর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড' বিকৃত ভাবী সমাজ-কল্পনা। আর যাই হোক না কেন, বার্ণার্ড শ জীবনের শেষ পর্যন্তও বিশ্বাস হারান নি যে,

সোস্যালিস্ট ব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের পূর্ণতর প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

শ-এর সোস্যালিস্ট চিন্তা ও কর্মাদর্শের অসঙ্গতি ছিল বৈকি। এবং তার কিছু কিছু কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও রুচি গড়ে উঠেছিল ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের সমারোহের মধ্যদিনে। ধনতন্ত্রের প্রসার তখনও কিছু কিছু বিত্তহীন মানুষের কাছে হঠাৎ ভাগ্যমন্ত হবার সুযোগ এনে দিতে পারছিল। শ নিজের জীবনেই দেখেছিলেন দৃঢ়সংকল্প থাকলে কিভাবে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আর আশা করেছিলেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝালে, চাপ দিলে মনিব শ্রেণীকে সৎপথে আনা যায়, তাদের স্বচ্ছলতা থেকে বিত্তহীনেরাও অংশ পায়। মার্কস্ অবশ্য ভালমতই পড়েছিলেন শ; হয়ত সেইজন্যই শ্রেণীসংগ্রাম অপেক্ষা মামুলী গণতন্ত্রের পথ ভালো, এই ফেবিয়ান তত্ত্ব তিনি বিনাদ্বিধায় মেনে নিতে পারেন নি। ফেবিযান সোস্যালিস্ট কর্মপন্থা সম্বন্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ-এর মনে নানা সংশয় ছিল। ১৮৮৪ সনে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠার শুভদিনেও তিনি লিখতে ভয় পাননি, 'we had rather face a Civil War than such another century of suffering as the present one has been'; আবার ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানী যখন প্রত্যেক ডিউক ও ডাচেসের সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্যে বিগলিত প্রায় তখনও শ-ই সাবধানবানী উচ্চারণ করেন, 'Messrs Henderson and Clynes can no more make our political machine produce socialism than they can make a sewing machine produce fried eggs'. (Dictatorihıp of the Proletariat).

'সেণ্ট জোয়ান' (১৯২৪) নাটকেও সম্ভবতঃ শ-এর মূল বক্তব্য —নূতন সমাজ-গঠনব্রতী কর্মী বা নায়কের আদর্শে দৃঢ়তা ও একাগ্রতা চাই। কিন্তু শ কেবল 'হিরো'কেই চেয়েছেন ও তাকে গণশক্তির ঊর্ধ্বে

স্থান দিয়েছেন। এইজন্য তাঁর বাণী অনেকক্ষেত্রে রচিত হয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান নায়কদের উদ্দেশে। ব্যঙ্গ উপহাস এবং অতিশয়োক্তির মধ্য দিয়ে তিনি প্রাচীনকালের 'প্রফেটদের' মত আমাদের কর্তাব্যক্তিদের সাবধান করেছেন, 'Repent or Perish' মার্কস্ হৃদয়ঙ্গম করার ফল একদিকে, আর অন্যদিকে ওয়েবদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী মহলে অপ্রিয় সত্যভাষণের খ্যাতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। প্রথম জীবনে শ লিখেছিলেন, 'অসামাজিক সোস্যালিস্ট' শেষজীবন পর্যন্ত ছিলেনও তাই। সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও তীক্ষ্ণ বাস্তবচেতনা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন গণশক্তিতে বিশ্বাসহীন গণ-বিপ্লবের স্তুতিকার। আশ্চর্যের কথা নয়, টম ম্যান, জন বার্নস ও কেয়ার হার্ডির নেতৃত্বে যখন সোস্যালিজম সংগ্রামী রূপ নিচ্ছিল ইংলণ্ডে, তখন শ লিখেছিলেন, 'লক্ষপতিদের জন্য সোস্যালিজম' (১৮৯৬)—বক্তব্য হল, জনগণ যা চাইতে সাহস করে না অথচ তাদের চাওয়া উচিত, লক্ষপতিরা জনগণকে তাই দিন। শেষজীবন পর্যন্ত শ লক্ষপতিদের ভয় দেখিয়েছেন সাম্যবাদের রুদ্র আবির্ভাবের আর প্রফেটের মত উপদেশ দিয়েছেন 'Repent or perish' (হয় অনুতাপ কর, নয় বিনাশ অনিবার্য)।

১৯২০—৩০এ ধনতন্ত্রের দুনিয়াজোড়া সংকট; তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য দেখে শ-এর উপদেশ ও বাণী আরও প্রখর, আরও স্পষ্ট হয়েছে। শ-ওয়েল্স বিতর্কে (১৯৩৪) তার তীক্ষ্ণ, রসাল বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও শেভীয় সিদ্ধান্ত হল, ইংলণ্ডের যুবরাজ যেন একবার সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করে আসেন। যুবরাজ ও ডিউক আর্লদের উপরই যেন সমাজের আমূল পরিবর্তনের দায়িত্ব নির্ভর করছে। 'য়্যাপলকার্টে' মামুলী গণতন্ত্রের ব্যর্থতার যে ব্যঙ্গচিত্র শ এঁকেছেন তার অর্থ হল, জবরদস্ত ও বুদ্ধিমান লোকই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

ধনতন্ত্রের মুনাফা-শিকারবৃত্তি যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা তিনি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে দেখিয়েছেন 'ভাঙ্গন লিমিটেডে'র কার্য-

কলাপ বর্ণনা করে। তবু কি 'য়্যাপলকার্টে' কি 'অন্দি রকসে' তিনি গণশক্তিতে আস্থা স্থাপন করেন নি ; ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র ও মামুলী গণতন্ত্রের সংকটকে বিশ্লেষণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত সর্বত্রই হল—সমাজব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে স্বৈরাচারী নায়কেরই প্রধান ভূমিকা। গত মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে মার্কসীয় কর্মাদর্শের প্রতি শ-এর ঝোঁক আরও তীব্র হয়েছিল বটে, অন্ততঃ ১৯৪৪ সনে 'এভরিবডিস্ পলিটিক্যাল হোয়াটস্ হোয়াট' গ্রন্থে তিনি মার্কস্‌বাদী কর্মপন্থার সপক্ষে রায় দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-ও তাঁর খাপছাড়া ধরণে। যাঁরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিভাবক ও সমর্থক, তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে শ আবেদন করেছেন রাজনীতিতে মার্কসীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-সংকটের মূল যে শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত এই কথাটি শ কখনও সহজভাবে মেনে নেন নি। কাজেই তাঁর চোখে সংকট থেকে পরিত্রাণের কর্তা হল বুদ্ধিতে, শক্তিতে, উৎসাহে ভরপুর নায়ক—মেজর বারবারার (১৯০৫) লক্ষপতি য়্যানড্রু আণ্ডারসাফ্‌ট। আণ্ডারসাফটের ব্রত হল দারিদ্র্যের উচ্ছেদ, কারণ দারিদ্র্যই জঘন্য-তম অপরাধ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আণ্ডারসাফ্‌টদের পরিবর্তন পরিকল্পনায় শোষিত দরিদ্র সাধারণের কোনো ভূমিকা নাই, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ ঘোষণা করেছে তারা জনতাকে ঘৃণা করে; দরিদ্রের পরিত্রাতা শেষ পর্যন্ত বন্দুক কামানের কারখানা চালিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের অসম্ভব কল্পনায় আশ্রয় নেয়।

শ এক জায়গায় বলেছেন, নির্বুদ্ধিতাই সমস্ত দুর্গতির মূল—সমাজের বিরোধ চলছে বিচক্ষণতা ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে। তাঁর মতে বুঝতে পারে তারাই, যারা জন্ম থেকে সাম্যবাদী—যেমন তিনি—আর যারা অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে আঘাত পেতে পেতে সাম্যবাদী হয়। বাদ বাকী মানুষ যেন বন্ধ ঘরে বোলতার মত বারবার কাঁচের শার্সীতে মাথা ঠুকছে, অবশেষে বুদ্ধিহীন নিশ্চেষ্টতার কাছে আত্মসমর্পণ করছে।

শ অবশ্য ৯৪ বৎসর বয়সেও আত্মসমর্পণ করেন নি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সমাজসচেতন বুদ্ধির এইটাই হ'ল আকর্ষণীয় দিক। প্রায় এক শতাব্দীর সভ্যতার জটিল আবর্তের মধ্যেও তিনি দিশা হারাননি—এ যুগের এলিয়ট, হাক্সলীদের মত। মিল, মার্কস্, ওয়েবকে নিয়ে যাঁর পরিক্রমা শুরু হয়, ফ্রয়েড ও ফ্রেজার, লেনিন ও স্টালিন, বুয়র যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সোভিয়েট বিপ্লব, নতুন চীনের অভ্যুত্থান, পরমাণবিক বোমা, মূলধনী মহাজনদের নতুন যুদ্ধ-প্রস্তুতি সমস্তই তাঁর মানসক্ষেত্রে রেখাপাত করেছে এবং তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তব করেছে যে, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবসান ঘটবেই!

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্মের মত তাঁর লৌকিক স্থান ছিল ধনতান্ত্রিক শিবিরে, আর নৈতিক অনুরাগ ছিল ভাবী সমাজের নির্মাতাদের পক্ষে।

১৩৫৮

বার্ণার্ড শ বনাম জি. বি. এস.

জর্জ বার্ণার্ড শ সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নেই, না থাকাই স্বাভাবিক। সেক্সপীয়রের সমতুল্য তাঁর খ্যাতি; সুদীর্ঘ জীবন অদ্ভুত বিপরীতধর্মী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব, সব কিছু মিলিয়ে সমসাময়িক কালে এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। তবে শ-এর প্রতি এই আকর্ষণ সবখানি বুদ্ধিগত নয়; অনেক খানি কল্পনা ও কিম্বদন্তী দিয়ে গড়া। বার্ণার্ড শ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ,প্রায় ষাট বৎসরকাল এত কথা বলেছেন যে শেভীয় ভাবসম্পদকে আয়ত্ত করাই দুষ্কর। আর এই ষাট বৎসর হ'ল সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কঠিনতম পরীক্ষার যুগ। সংস্কার ও সংগ্রাম, প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যবিরোধী শক্তির উত্থান পতন, ঘাতপ্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ, টলমল এই যুগে জর্জ বার্ণার্ড শ ছিলেন একাধারে কথক ও দর্শক, শ্রোতা এবং অভিনেতা। সেই জন্যই জর্জ বার্ণার্ড শ-এর একরঙা ছবি এঁকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা অসম্ভব।

শিয়রের কাছে বুদ্ধমূর্তি ও স্টালিনের ছবি রেখে যে বার্ণার্ড শ মৃত্যুশয্যায় শায়ীন তিনিই একদা ভগবান ও অবতারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন; আবার তিনিই ছিলেন ফেবিয়ানপন্থী সোস্যা-লিজমের পুরোধা। লেনিন যে কালে বলেছিলেন শ হচ্ছেন 'ফেবিয়ানদের খপ্পরে পড়া ভালো মানুষ' তার পরও শ আর এক যুগ বেঁচেছিলেন। দেখেছিলেন ফেবিয়ান সোস্যালিজমের চরম পরাজয় ও প্রতারণা; এবং দেখে খুসী হন নি মোটেই। ফেবিয়ানদের খপ্পরে পড়া ভালোমানুষটীর জীবনে বা চিন্তায় তবু কোনো গভীর সংকট

দেখা দেয়নি, যেমন দেখা দিয়েছিল ইউরোপের অনেক বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সোস্যালিস্ট কর্মীর জীবনে। আঁরি বারবুস, রমঁ্যা রলাঁ, আর্ণস্ট টলার এবং অনেক প্রগতিশীল ইউরোপীয় শিল্পী বলশেভিক বিপ্লবের পরে তাঁদের পথ বেছে নেন বিনা দ্বিধায়। জর্জ বার্ণার্ড শ ঠিক এমন ভাবে সংগ্রামী গণআন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি কখনও। সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার প্রশংসা তিনি করেছেন, বলশেভিক 'রাশিয়ার সমর্থনে' তিনি ওয়েলস, কীনস, রাসেল, এবং আরো অনেক অভিজাত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ চালিয়েছেন, মার্কিনী ধনতন্ত্র এবং ম্যাকডোনাল্ডী সোস্যালিজমের 'নির্বুদ্ধিতা'কে বিদ্রূপ করেছেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। তবুও জর্জ বার্ণার্ড শ সংগ্রামী গণসমষ্টির সহযাত্রী হন নি, হতে চান নি। নিন্দা বা প্রশংসার কথা নয়—জর্জ বার্ণার্ড শ-এর প্রতিভা যে ভাবে, যে পবিবেশে বর্ধিত হয়েছে তার স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল কথক বার্ণার্ড শ, তিনি দর্শকও—সমাজ-বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন তবু বিরোধের উর্ধ্বে, নির্লিপ্ত।

ফেবিয়ানদের খপ্পরে পড়া শ-এর মধ্যে লেনিন যে ভালোমানুষটী দেখেছিলেন সেই মানুষ অবশ্য একদা কেবল দর্শকমাত্র ছিলেন না, সমাজ-বিরোধের উর্ধ্বে শ্রদ্ধেয় পিতামহের স্থানও তিনি এক লম্ফে দখল করেন নি। এই ভালোমানুষটী যখন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছান সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়, তখন তাঁর মনে বড়ো হবার, শ্রেষ্ঠ লেখক হবার বাসনা ছিল, একথা শ নিজেই বলেছেন। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস তখন জীবিত, তবে খাস ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী এবং ভদ্রলোক মহলে তাঁদের সম্বন্ধে ভয় এবং অবজ্ঞাই প্রবল। ইংলণ্ডের জলহাওয়ার গুণ নয়, ডিজরেলীর সাধের স্বপ্ন তখন সাম্রাজ্যরচনা করছে, ধনতন্ত্রের উন্নতি ও উপনিবেশের লুঠের ছিটে ফোঁটা মজুর শ্রেণীকে দিয়ে 'ক্ষুধার্ত, বিক্ষুব্ধ' ১৮৩০-৪০ সনের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মর্লি বলেছেন, ১৮৪০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ইংলণ্ডে বড় সুখের সময়, সোস্যালিজমের ধূয়াতে কতকগুলি বিদেশী বেয়াড়া লোক ছাড়া আর কেউ সাড়া দেয় না। স্যামূয়েল স্মাইলসের 'আত্ম-নির্ভরতা' হল ঐ

যুগের সংহিতা ; বার্ণার্ড শ ঐ সংহিতা পড়েছিলেন কিনা জানি না, তবে বিত্তহীন শ্রমজীবীকে আত্ম-নির্ভরতার পথে উন্নতির উপদেশ ছিল ঐ সময়ের মনিবদের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিক থেকে দেখলে অনুমান করা যায় কেন ফেবিয়ান শ শ্রেণী সংগ্রামকে আজগুবী বলে উপহাস করেছেন। একথা ঠিক, তাঁর নিজের স্বীকৃতিতেই মার্কসের 'ক্যাপিটাল' পড়ার ফলে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং অসঙ্গতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট আকার নেয়। কিন্তু শ্রেণী বিরোধকে ইতিহাসের গতিনিয়ামক হিসাবে শ গ্রহণ করেন নি। তিনি মানুষকে স্বাভাবিক জীব হিসাবে সমাজপ্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছেন আর ধরে নিয়েছেন যে স্বাভাবিক মানুষের বুদ্ধিহীনতার ফলেই ধনতন্ত্রের অরাজকতা ও বিপর্যয়। এই মানুষকে যদি যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় সমাজতন্ত্র অনেক নিরাপদ ও আরামের তাহলেই সমাজ সংকটের সমাধান সহজ হয়ে যায়। এই হ'ল ফেবিয়ান যুক্তি।

শ অবশ্য সরাসরি ফেবিয়ান সিদ্ধান্তে এসে পৌছান নি এবং এইখানেই শ-এর জীবন ও প্রতিভার বিস্ময় ও বৈচিত্র্য। ডিজ্‌রেলীর সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডেও চার্টিস্ট বিদ্রোহের বারুদের গন্ধ ছিল। ১৮৮০ সন নাগাদ ধনতন্ত্রের সংকটে ইংলণ্ডে আবার জনসাধারণের দুর্গতি এবং অসন্তোষ প্রবল হচ্ছিল। এহেন সময়ে শ এর মত বিত্তহীন ভাগ্যান্বেষী আইরিশ তরুণ ইংলণ্ডে এসে বৈপ্লবিক চিন্তা ও কার্য-কলাপের দিকে আকৃষ্ট হবে, খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে কথায় আছে, 'পৃথিবীর ধূর্ততম পুঁজিপতি ও সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক সমাজ-তন্ত্রী' হ'ল ইংলণ্ডে। ধূর্ততম পুঁজিপতিরা শ্রেণীসংগ্রামকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছিল, সংস্কারের মধ্যস্থতায় শোষিত শ্রেণীদের কিছু কিছু সুখ সুবিধা দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিল। ফেবিয়ান সোশ্যালিজম এইজন্যই মনিব-শ্রেণীর বিচক্ষণতায় ভরসা দিতে সাহস করেছিল। আর জর্জ বার্ণার্ড শ তাঁর নাটকে, পুস্তিকায়, বচনে উপরতলার লোকদের উদ্দেশে সদুপদেশ ও যুক্তির অবতারণা

করে কর্তাব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবাদের 'জ্ঞানচক্ষু' উন্মালনের চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু যেহেতু জর্জ বার্ণার্ড শ হচ্ছেন বিদ্রোহী বুদ্ধির বিগ্রহ, উপরন্তু ইংলণ্ড-বিজয়ের অভিযাত্রী আইরিশম্যান, কাজেই নিরামিষ ফেবিয়ানিজমও তাঁর কথায়, কলমে, অভিনয়ে ধারালো হয়ে উঠেছিল কখনও কখনও আশ্চর্যভাবে। ভালোমানুষ হিসাবে শ-এর কাছে দারিদ্র্য, গণিকাবৃত্তি, বস্তিজীবন, পুঁজিপতিদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা, বুর্জোয়া সংস্কৃতির অনেক রোমান্টিক ছলাকলা ঘৃণার, উপহাসের বিষয় হয়েছিল কথক প্রচারক বার্ণার্ডশ তাঁর নিজস্ব ভূমিকা ভোলেন নি। যে-কালে যুক্তিতর্কই ছিল বুর্জোয়া প্রগতির হাতিয়ার সে কালে সোশ্যালিষ্ট শ-এর পক্ষে আবেদন প্রচারের পথ বেছে নেওয়া অস্বাভাবিক কিছু হয় নি। এই প্রয়াসে সফল হয়েছিলেন শ, তার কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজেব বিবোধ বুদ্ধিজাবামহলে দুশ্চিন্তা ও ভয় সৃষ্টি করেছিল অথচ মার্কস্-মবিস-হাইণ্ডম্যানেব সংগ্রামা কর্মাদর্শ বুদ্ধিজীবী-দের রুচি, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে ছিল। বুদ্ধির সাধনাও সহজ নয় কিন্তু নিরাপদ ও সভ্যভব্য যতক্ষণ জন-সাধারণেব সঙ্গে ঘর্মযোগে মিশে না যায়।

সংগ্রামী জনসাধারণকে বাদ দিয়ে বুদ্ধিব অভিযানে শ অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই সম্ভবতঃ বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্পষ্টবাদিতা সহজেই আদৃত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণকে এড়িয়ে চলার সংকল্প সিডনী ওয়েব ও অন্যান্য ফেবিয়ানরা সহজে নিতে পেরেছিলেন, শ পারেন নি। স্বচ্ছল উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ আমলা ওয়েবের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভাগ্যতাড়িত আইরিশ তরুণ শ-এর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল প্রথম থেকে শেষে পর্যন্ত। মার্কস্ এবং হেনরী জর্জের ভক্ত শ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি, সম্পত্তির মালিক ও মনিবেরা কেবল সুযুক্তির প্রেরণায় সমাজের আমূল পরিবর্তনে সায় দেবে।

ফেবিয়ান সোশ্যালিজমের দ্বিতীয় প্রচার পুস্তিকায় শ তাই লিখেছিলেন ১৮৮৪ সনে, বর্তমানের দুর্গতির চেয়ে গৃহযুদ্ধও বরণীয়। কিন্তু এ কেবল বুদ্ধিগত ইঙ্গিত, আর এমন ধরণের বহু দুঃসাহসী ইঙ্গিত বিভিন্ন কালে শ-এর লেখায় বিক্ষিপ্ত আছে—ফেবিয়ান পুস্তিকার মেজর বারবারায়, 'সর্বহারার একনায়কত্ব' এবং 'অন দি রকসে'। কিন্তু শ গণসংগ্রামকে তাঁর নাটক ও কাহিনীতে বিশেষ স্থান দেন নি।

হয়ত ট্রাফালগার স্কোয়ারে গণবিক্ষোভে অংশ নিতে গিয়েই গণসংগঠনের উপর শ-এর অনাস্থা সুপরিণত রূপ নেয়। ১৮৮৭ সনের নভেম্বর, সময়টা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। ফেবিয়ান সোসাইটি তার তিন বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে। কিন্তু ওদিকে মরিস হাইণ্ডম্যানের গণতান্ত্রিক ফেডারেশন, জন বার্ণস ও টম ম্যানের জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথও নির্দেশ করছে আর ব্যবসায় সংকটের ফলে দুর্গত মজুর ও বেকারের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ফেবিয়ান শ-এর মনে এই উত্তাপের আঁচ লেগেছিল, এবং এইটাই 'ভালোমানুষ' শ-এর প্রকৃত নিদর্শন। ফেবিয়ান আমলা ওয়েব্ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের দলভুক্ত হয়েও শ ট্রাফালগার স্কোয়ারের গণবিক্ষোভে অংশ নিতে এগিয়ে আসেন; এই-ই শেষ বার। সৈন্য এবং পুলিশের বেটনের তাড়নায় সববেত জনতা যখন নেতৃত্বের অভাবে দিশাহীন, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন অকস্মাৎ শ উপলব্ধি করলেন জনগণকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার; মনিব-শ্রেণীর অস্ত্র এবং অর্থবল ধ্বংস করাও জনগণের সাধ্য নয়।

ইউরোপ ভূখণ্ডে কাউটস্কী, বার্ণস্টীন এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পন্থী সোশ্যাল ডেমক্রাটেরাও এই রকম সিদ্ধান্তে পৌছুলেন কিছুকাল পরেই। দেখা যাচ্ছে, ফেবিয়ান-শেভিয়ান আদর্শ ও কর্ম-কৌশল একটা বিশেষ শ্রেণীগত পরিমণ্ডলের ফল। যাঁরা গণশক্তিকে প্রথমে রোমান্টিক দৃষ্টিতে সর্ব শক্তিমান ও নির্ভুল কল্পনা করেন তাঁরা গণসংগঠনের কষ্টকর কাজ এড়িয়ে হঠাৎ লোক ক্ষেপিয়ে ক্ষমতা

দখলের স্বপ্ন দেখেন। তারপরে এই স্বপ্ন যখন রাষ্ট্রশক্তির আঘাতে ধূলিসাৎ হয় তখন মনিবশ্রেণীর উপর ভয়-মিশ্রিত ভক্তি দেখা দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে আসে গণশক্তির উপর অবজ্ঞা। তখন সমাজ বিরোধের সমাধান খোঁজা সুরু হয় বুদ্ধির জ্যামিতি দিয়ে, ধীরে ধীরে মনিবতন্ত্রের হৃদয় ও গতি পরিবর্তনের নীতিকে আশ্রয় করে।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে গণবিক্ষোভের আশা-ভঙ্গের পর শ প্রায় নিশ্চিত হলেন, এপথ সোশ্যালিজমের নয়। অতঃপর কথক বার্ণার্ড শ-এর জীবনের ব্রত হল সোশ্যালিজমকে 'নিয়মতান্ত্রিক, সভ্যভব্য ও কার্য্যকরী' করা। শেষ জীবন পর্য্যন্ত শ-এর নাটক ও কথা লাপের মূল আবেদন হ'ল সোশ্যালিজমকে সভ্য ভব্য করা— মনিবশ্রেণী ও তার বুদ্ধিজীবী বাহনদের উপহাস করে, খুঁচিয়ে ভ্রূকুটী করে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, তাদের সামনে গুরুতর বিপদ সমুপস্থিত সমাজ সংকটের সমাধান করার দায়িত্ব তাদেরই। এই হিসাবে শ বুর্জোয়া সমাজের 'প্রফেট' আবার যেহেতু তিনি জর্জ বার্ণার্ড শ', নিজের অধ্যবসায় বলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার চূড়ায় উঠেছেন কাজেই স্বার্থান্ধ মনিবশ্রেণী উচ্ছন্ন গেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন না এরকম বেপরোয়া ভাবও তিনি দেখিয়েছেন। মার্কস্‌বাদী সোশ্যালিস্টদের বিদ্রূপ করেছেন মস্তিষ্কহীন রোমান্টিক বলে, আবার ফেবিয়ানদের ভীরুতা ও আত্ম-প্রতারণাকেও কষাঘাত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়ই বলতে হবে, মার্কস্ যিনি পড়েছেন ও স্বীকার করেছেন মার্কস্‌ই তাঁর সোশ্যালিস্ট দৃষ্টিভূমি প্রসারিত করেছেন, যিনি বলশেভিক বিপ্লব ও পরবর্তী কালে ইউরোপে বিরাট গণজাগরণ লক্ষ্য করেছেন তিনি একবারও গণ-শক্তির স্বরূপ ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন নি। উপরন্তু 'জীবন সৃজনী শক্তির' (Creative force) বিবর্তনের অলৌকিক ধারণা তিনি প্রচার করেছেন বলশেভিক বিপ্লবের অনতিকাল পরে, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকট যখন স্পষ্টই বিপজ্জনক হয়েছিল।

ফেবিয়ানদের খপ্পরে পড়া ভালমানুষটী তবুও সহস্র অসঙ্গতি ও

অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সমাজ প্রগতির অনিবার্য ধারা সম্বন্ধে সাহসিকভাবে বলেছেন। প্রতিভা শ-এর ত একটী নয়, আধ ডজন বার্ণার্ড শ-এর বিরোধই (battle of the Bernard Shaws) জর্জ শ চরিত্রের আকর্ষণ। শ-প্রতিভা অননুকরণীয় তার কারণ শ ছিলেন প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেকটী মতেরই প্রতিবাদী, কেবল তাঁর নিজস্ব মতটী ছাড়া। কি ছিল তাঁর মতটী তা সুনির্দিষ্টভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা অসম্ভব কারণ শ বেঁচেছিলেন দীর্ঘকাল, এই দীর্ঘকাল ধরে সারা দুনিয়া জুড়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ ছিলেন তার ভাষ্যকার, তার নানা বিরোধী প্রভাবও তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরিয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন, সাম্যবাদ ও স্টালিনের প্রতি তাঁর শেষ জীবনের শ্রদ্ধা আপাত দৃষ্টিতে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু ১৮৮৪ সনের ফেবিয়ান পুস্তিকায় যিনি গৃহযুদ্ধও কাম্য হতে পারে লিখেছিলেন পববর্তীকালে তাঁর সোভিয়েট ও সাম্যবাদপ্রীতি খুব অস্বাভাবিক নয়। উপরন্তু ১৯২৯-৩০ এর ধনসংকট এবং দুই মহাযুদ্ধই মামুলী গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দেউলিয়াপনা চূড়ান্তভাবে দেখিয়েছে। একথা শ বার বার স্বীকার করেছেন। শ-এর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ওয়েব-দম্পতি সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন সভ্যতা বলে তারিফ করেছিলেন, এটাও আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাঁরা চিরকালই ছিলেন পরিকল্পনামাফিক সমাজব্যবস্থা গঠনের পক্ষপাতী। মতবাদ ও কর্মপন্থার প্রশ্ন এড়িয়ে তাঁরা সোভিয়েট সমাজের গঠনরীতিকে যুক্তি ও বুদ্ধির ছকে বিচার করে ছিলেন ও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ-এর কাছেও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমৃদ্ধি ও সফলতা এই ধরণের বুদ্ধির জয় বলে মনে হয়েছে, অর্থাৎ তিনি তাঁর পাঠক, অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন, 'এই দেখ, বুদ্ধির কৌশলে লেনিন স্টালিন বলশেভিকরা কেমন তোমাদের কিস্তিমাৎ করেছে।'

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই ত জর্জ বার্ণার্ড শ দেখেছেন

কি ভাবে জি, বি, এস-এর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরোধী চিত্ত জয় করেছে। শেষ পর্যন্ত শ ছিলেন বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্রোহী, বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রফেট ও পাপ-স্বীকারোক্তি ঘোষণার প্রধান পুরোহিত। সেই কারণে তাঁর স্পষ্ট ভাষণ, সাহসিকতা ও স্ব-বিরোধী প্রতিভার দীপ্তি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বিষয়। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে তিনি যেন রচনা করেছিলেন সেতুবন্ধ—যারা এগিয়ে যেতে চায় ভাবীকালের দিকে, তারা শ-এর মধ্যে 'ভালমানুষটী'র সন্ধান পাবে, আর যারা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার লুপ্তপ্রায় ভাবসম্পদের মধ্যে নিরাপত্তার, সান্ত্বনার আশ্রয় চায় তারাও কথক-দর্শক শ-এর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও সমুজ্জ্বল ভাষণের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতে পারে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির শেষ সর্বজনীন প্রতিভার প্রতি আমাদের অনুরাগ ও বিরাগের দ্বৈতলীলার মর্মকথা হ'ল এই সভ্যতার দোটানা, যার ফলে শ ভালোমানুষ, বড়োমানুষ আবার অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের মনের মত মানুষও।

১৩৫৯

হাক্সলী ও নিড্‌হ্যাম

সর্বদর্শন সংগ্রহের মত অল্‌ডাস হাক্সলী সংকলন করেছেন সর্বধর্মসার। হাক্সলীর কাছে এখন অবশ্য ধর্ম এবং দর্শনের কোনো বিরোধ নেই, ব্যবধানও নেই। সর্বধর্মের সার হল তাঁর মতে চিরন্তন দর্শন, লাইবনিস যাকে বলেছেন Philosophia Perennis. এই চিরন্তন দর্শনের সাধনমার্গ অন্তত আমাদের দেশে চিনিয়ে দিতে হাক্সলীর সাহায্য দরকার হয় না, কারণ সাধু-সন্ত-সুফী-বাউলদের ভক্তি-সাধনার পথ আমাদের খুবই চেনা। কিন্তু হাক্সলীর নিজের জীবনে এর অভিনবত্ব আছে বৈকি। 'গাজা'র অন্ধ মানুষটি বুদ্ধির অনেক চোরাগলি ঘুরে শেষ পর্যন্ত চক্ষুষ্মান্‌ হয়েছেন। বৃহৎ-বুদ্ধির অহমিকার স্বাভাবিক পরিণতিই এই। দুইযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে যে-সব উগ্র যুক্তিবাদী কেবল সমালোচনাকেই সর্বস্ব মনে করেছিলেন, বহুমানুষের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের জীবনকে যুক্ত করেন নি, তাঁদের সকলেই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিতে আস্থা হারিয়েছেন, যুক্তি ছেড়ে প্রত্যয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদেরই বুদ্ধিবিলাস এবং অবশেষে বুদ্ধি-বিয়োগ লক্ষ্য করে রলাঁ বলেছিলেন, 'যে অহংকার নিজেকে চেনে, চেনেনা নিজের দীনতাকে, সেই অহংকার বুর্জোয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে।' হাক্সলীর বুদ্ধি-গর্ব যেমন উগ্র ছিল এককালে, তার প্রতিক্রিয়া তেমনি প্রবল হয়েছে তাঁর মানসলোকে। তবু এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, ভাগবত জ্ঞানের উপর হাক্সলীর বিশ্বাস এখনো পাকাপোক্ত হয়নি। কার্লাইলের 'চিরন্তন-বিশ্বাসের' (Everlasting yea) পেছনে যেমন সব সময়ে উঁকি মারত 'চিরন্তন সংশয়' (Everlasting Nay), হাক্সলীর অধ্যাত্মজীবনেও হয়ত তেমনি বিরোধের বীজ রয়ে গেছে। অধ্যাত্মবাদী হলেও, কার্লাইল আন্তরাশ্রয়ী ছিলেন না। মানবমুক্তি বলতে মানুষের

সমাজ-জীবনের গভীর সংকট সমাধান করা জরুরী দরকার একথা কার্লাইল ভোলেননি। তবু তো তখনও ছিল কেবল Condition -of-England question; আর এখন হল Condition-of -the world question. হাক্সলী সেটা ভালমতই জানেন এবং সেইজন্যই তাঁর সাধন-ভজনের মার্গ সভ্যতার সংকট সমাধানে কার্যকরী কিনা এ বিষয়ে হাক্সলীর নিজের মনেও সংশয় আছে বোধ হয়। এই সংশয় প্রবল বলেই সাধক হাক্সলী মাঝে মাঝে তাঁর পুরনো ভূমিকাতে দেখা দেন,—দেখা দেন সমস্ত রকম সামাজিক পরিবর্তন প্রচেষ্টার বিরোধীরূপে। Grey Eminence থেকে Time Must Have a Stop পর্যন্ত বুদ্ধি-বিরাগী হাক্সলীর বাণী হল ব্যর্থতার—কিছু হবে না,' কিছু হতে পারে না, সভ্যতার দুর্গতি দূর করবার জন্য যাই চেষ্টা কর না কেন, কোনো পথ নেই; অথবা একমাত্র পথ হল আত্মশুদ্ধির পথ। হাক্সলীর পাশে নিড্‌হ্যামকে দাঁড় করালে এ যুগের আধ্যাত্মিক বিরোধের রূপ আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে। নিডহ্যাম ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানী; তবু তিনি সমাজ-সচেতন।

হাক্সলী যে পথের সন্ধান দিচ্ছেন, সেপথ শুধু অধ্যাত্মবাদী নয়, গুপ্ত অধ্যাত্ম বিদ্যার পথ এবং এই পথে চলার অধিকার ভেদ আছে; গুরু চাই, যৌগিক সাধন ভজনে সিদ্ধি চাই, আর তার ওপরে চাই এই আত্মসর্বস্ব আন্তরাশ্রয়ী বিশ্বাস—'Do what you will this world is a fiction.' অতএব এই মায়াময় জগতের পরিবর্তনের চেষ্টা করে কী ফল হবে? যা আছে তাই ভাল, বরঞ্চ পরিবর্তনের চেষ্টা করতে গেলে তোমারই আত্মা কলুষিত হবে, বরঞ্চ বোধিসত্ত্ব হবার সাধনা কর, পরিণাম শুভ হবে। হাক্সলীর চিরন্তন দর্শনের মূল-তত্ত্ব হল এই। আলডাস হাক্সলী এবং জোসেফ নিড্‌হ্যামকে পাশাপাশি দাঁড় করালে কি আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে আমাদের যুগের আধ্যাত্মিক সংকটের রূপটি। বিজ্ঞানী নিড্‌হ্যাম্ ধর্মপ্রাণ হলেও তাঁর ধর্মবুদ্ধি হাক্সলীর সমাধানে সায় দেয় না। তাঁর মতে, 'The message will reach those for whom it is intended surely

enough by way of the popularising pulpits and microphones. Aspire to sainthood, they will say, and always remember that saints, like scientists, must keep out of politics.'

হাক্সলীর এই অধ্যাত্মবিলাসের ব্যর্থতা হাক্সলী নিজেই দেখাতে পারেন—অন্তত এক যুগ আগে দেখিয়েছেন আজকের হাক্সলী যে নিত্য-সত্যকে জীবনের চরম আশ্রয় বলে নিয়েছেন, সেই সত্য একদিন তাঁর কাছে ঠিকই অবাস্তব মনে হয়েছিল—'The ideas of Plato, the One of Plotinus, the Alls, the Nothings, the Gods, the Infinites, the Natures of all the mystics of whatever religions, of all the transcendental philosophers, all the pantheists—what are they but convenient and consoling substitutes for the welter of immediate experience, home-made and therefore home-like spiritual smuggeries in the alien universe' শেষ পর্যন্ত হাক্সলীও যে এইরকম উত্তুঙ্গ আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয় নিয়েছেন তার কারণও উপরোক্ত মন্তব্যে সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন সুইফট্ তেমনি হাক্সলী দুইজনেই 'welter of immediate experience'-এর মধ্যে কোন সুস্থ বাস্তব সত্যের ইঙ্গিত পাননি। দুজনের চোখেই বিশ্বজগত হল alien universe এবং এই জগতে বাঁচবার চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা। Brave New World এবং Gulliver's Travels এর চতুর্থ খণ্ডের লেখক আলাদা, কিন্তু বৃহৎ-বুদ্ধির ব্যর্থতা দুজনেরই ক্ষেত্রে একরকম। সুইফ্‌টের পরিণাম হল বুদ্ধি লোপ, উন্মাদ রোগ—যার আশঙ্কা তিনি নিজেও সব সময়ে করেছিলেন ('I shall die at the top first'—Swift); হাক্সলীর হল বুদ্ধি-বিরাগ, যুক্তি থেকে ভক্তিতে ভাগ্য সমর্পণ—হাক্সলীর নিজেরই ভাষায় যাকে বলা যায় 'still and formal death for the bewildering movements of life' হাক্সলীর আধ্যাত্মিক

নিরুদ্দেশ যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি তাই সেই কাল্পনিক স্বর্গলোকে যেখানে সূর্য চন্দ্র তারকার প্রবেশ নিষেধ, সময় যেখানে সময়হীন।

নিড্হ্যামের Time the Refreshing River ঐ দিক দিয়ে বলতে গেলে হাক্সলীর Perennial Philosophyর উত্তরই। দেশ-কাল নিরপেক্ষ নিত্য সত্যে নিডহ্যামের বিজ্ঞানী-বুদ্ধি বিশ্বাস করে না। সময়ের নিরন্তর স্রোতে অবগাহন করে যুগে যুগে নতুন সত্যোপলব্ধি হল নিডহ্যামের মতে মানব-সভ্যতার মূলকথা। হাক্সলীর বুদ্ধি-গর্বের পতনের একটি কারণ হল, তিনি মানব-সভ্যতাকে বাস্তবের ক্ষেত্রে দেখেছেন যন্ত্রের মত পুনরাবৃত্তি করতে এবং সেই ধারণা থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া—এই যান্ত্রিক আবর্তন থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হল সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন থাকা এবং বোধির পথে চিত্তপ্রশান্তির সন্ধান করা। নিডহ্যামও ধর্ম-প্রাণ, কিন্তু তাঁর চোখে সভ্যতার মূল রূপটী অমন বিবর্ণ একঘেয়ে যান্ত্রিক ভাবে দেখা দেয়নি। তিনি সভ্যতার বিচিত্র বিকাশকে জড়বস্তু বলে অবহেলা করেননি, আবার মানুষের আধ্যাত্মিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে নিতান্ত আন্তরাশ্রয়ী বলে মেনে নেননি। নিডহ্যামের সমাধান তাই কাল্পনিক স্বার্থের সন্ধানে নয় তিনি 'Contradictions are not resolved only in heaven ; they are resolved right here, some in the past, some now, and some in time to come. This is the dialectical materialist way of expounding cosmic development, biological evolution, and social evolution, including all history.'

নিডহ্যামকে অবশ্য ঠিক ডায়লেকটিক বস্তুবাদী বলা যায় না। বিস্ময় সেইখানেই। নিডহ্যাম চেষ্টা করেছেন ডায়লেকটিক বস্তুবাদের সঙ্গে ধর্মের মানবিক সত্যের সমন্বয় করতে। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং অধ্যবসায় অসাধারণ। নানা যুগের সাধুসন্ত, ধর্ম-প্রবর্তকদের উক্তি সংগ্রহ করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে ধর্মেরও শ্রেষ্ঠ আবেদন হল

মানবমুক্তির এবং সেই মুক্তি কোন অলৌকিক জগতে নয়, এই জগতেই। যে স্বর্গরাজ্যের আশ্বাস ধর্মে আছে, তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ এই জগতেই এবং তার দায়িত্ব আমাদেরই। ধর্মের এই মানবিক, ইহজাগতিক সত্যকে নিডহ্যাম সংযুক্ত করেছেন ডায়লেকটিক বস্তুবাদের সঙ্গে এবং এর ফলে তাঁর সাধনার পথ হাক্সলীর মত গুপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা নয়, জাগতিক ব্যাপারে উদাসীনতা নয়; তাই নিডহ্যাম বলছেন, 'No more shall we take Goutama and Plato for our guide, but rather those determined men who from Confucius to Marx were vehicles of the evolutionary process, working through them to implement the Promise occluded in the very beginning of our world.' নিড্হ্যামের মূল যুক্তি কতখানি প্রমাণ-সহ তা এখানে বিচার্য নয়। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে ধর্মবুদ্ধি এবং ধর্মতন্ত্র একই পর্যায়ভুক্ত নয়—ধর্মতন্ত্রের পরিণাম হল হাক্সলীর চিরন্তন দর্শন, আর লক্ষ্য মানুষের জীবনকে সময়ের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করা। নিডহ্যামের ঐকান্তিক ধর্মবুদ্ধির দাবী হল বহুজীবনের সচেতন সহযোগিতা—অডেনের ভাষায় নিড্হ্যাম যার পরিচয় দিয়েছেন--

"O show us
History the operator, the
Organiser, Time the refreshing river."

Time the Refreshing River এবং History is on Our Side বই দুখানিতে নিড্হ্যাম যে মানবিক ধর্মের ব্যাখ্যা ও পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে ডায়লেকটিক বস্তুবাদীর কোনো আদর্শগত বিরোধ না থাকাই সম্ভব, নিডহ্যামের সমন্বয় চেষ্টায় যুক্তিগত দুর্বলতা কিছুটা রয়েছে। তবু মননশীল বাঙালী পাঠকমহলে নিডহ্যামের বহুল পরিচয় বাঞ্ছনীয়, কারণ অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের বিরোধ সম্বন্ধে আমাদের

অনেকের মনে যে রকম অতিরঞ্জিত ধারণা আছে, নিডহ্যামের আলোচনায় তার ভ্রান্তি অনেকখানি কেটে যাবে।

The Perennial Philosophy—Aldous Huxey. Chatto and Windus. 8s. 6d.

History is on Our Side—Joseph Needham. George Allen & Unwin. 7s. 6d.

Time the Refreshing River—Joseph Needham. George Allen & Unwin. 6s.

১৩৫৪

তিনখানি উপন্যাস

তিনখানি উপন্যাস—তিনটী যুধ্যমান দেশের নরনারীর কাহিনী। পার্ল বাকের 'ড্রাগন সিড' (Dragon Seed) চীনে জাপানী অভিযানের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। ওয়াণ্ডা ওয়াসিলেস্কার' 'রেনবো' (Rainbow) য়ুক্রেনে জার্ম্মান অধিকৃত একটী রাশিয়ান গ্রামের কাহিনী; ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের 'ফল্ অব্ প্যারিস' (Fall of Paris) ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা থেকে পরাজয় পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের এপিক উপন্যাস।

তিনখানি উপন্যাসই ঘটনাবহুল, কিন্তু সমস্যা কণ্টকিত নয়। শিল্পীর সমস্যা-ভীতি বা বিরাগ নেই, তবে ঘটনার চিত্ররূপ এতই সুস্পষ্ট এবং ইঙ্গিতময় যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ হতে হলে শিল্পীর মনে সামাজিক পরিস্থিত সম্বন্ধে, শ্রেণীস্বাথ ও আদর্শের সংঘাতসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা চাই। নিছক অন্ধ অনুভূতির প্রেরণায় সভ্যতার মরণান্তিক সংঘাতের উত্থান পতনকে রূপময়, সার্থক করা যায়না। শ্রেষ্ঠ সোভিয়েট শিল্পীদের কৃতিত্ব এইখানেই। তাঁরা ব্যক্তিকে পরিচয়বিহীন নির্বিশেষ পিণ্ডাকৃতি করেন না, প্রত্যেকটী মানুষের ভালোয় মন্দয় মেশানো সুনির্দিষ্ট আকার দেন; তেমনি সেই মানুষের ভাবনা ও কর্মের সঙ্গে সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের যোগসূত্রকেও হারিয়ে ফেলেন না। ১৯৩১ সনে রম্যাঁ রলাঁ সোভিয়েট শিল্পীদের লিখেছিলেন, 'আমাদের বুর্জোয়া সমাজের দুই দেবতা—ব্যক্তিত্ববাদ ও মানবতাবোধ আমাদের শত্রুদের ছেড়ে চলেছে তোমাদের নতুন সমাজে আশ্রয় নিতে।' ধনতন্ত্রের সেই সময়ে, বুর্জোয়া শিল্পীর ব্যক্তিত্ববোধ যখন আশ্রয় নিয়েছিল ব্যক্তি সর্বস্বতায়, রাষ্ট্রে যখন ব্যক্তির স্থান নির্দ্ধারিত হচ্ছিল ফুয়েরার ও ডুচের পাদপীঠতলে, তখন নতুন সমাজে মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

বিকাশের পরীক্ষা সফল হতে চলেছে। রেনবো এবং ফল্ অব্ প্যারিসে এই সকল ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবোধের পরিচয় পাই। পার্লবাকের লেখায় মানবতাবোধের অভাব নেই, বরঞ্চ অতিশয়োক্তি আছে। জাপানী বর্বরতার বর্ণনা যেন অনেক ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জাপানী অধিকৃত সহরের পথে প্রত্যেক চীনা রমণীর উপর একাধিকবার বীভৎস পাশবিক অত্যাচারের পুনরুক্তি বর্ণনাকে ক্লিষ্ট করে তোলে। অথচ কাহিনী রচনায় পার্লবাক একটা সুন্দর কৌশলের ব্যবহার করেছেন—যাতে ড্রাগন সিডের ঘটনাবলী অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের দেশকালাতীত, সর্বজনীন সম্পর্ক নির্দেশ করে। পার্লবাক সমস্ত উপন্যাসখানিতে কোথায়ও 'জাপান' বা 'জাপানী' শব্দটী পর্যন্ত ব্যবহার করেন নি! চীনা চাষীরা যখনই শত্রুদের নাম করেছে তখনি তারা 'পূব সমুদ্রের লোক' এই মাত্র পবিচয় দিয়েছে। তা ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে একটা অস্পষ্ট সর্বজনীন কল্পরূপ দেওয়াব জন্য পার্লবাক স্থান ও কালের চিহ্নগুলিও উল্লেখ করেন নি। পার্লবাকের উদ্দেশ্য জাপানী অধিকৃত অঞ্চলের চীনা জনসাধারণের জীবন বর্ণনা। বর্দ্ধিষ্ণু চাষী লিংটানের পবিবাবকে কেন্দ্র করে তার আখ্যান রচিত হয়েছে। লিংটান ও তার স্ত্রী লিংসাও এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শান্ত স্রোতহীন জীবনে জাপানী শাসন বিপর্যয় সৃষ্টি করল যাবা এতদিন কাটিয়েছে ক্ষেত ও খড়ে ছাওয়া বাড়ীর মধ্যে একটানা নিয়মেবাঁধা মাকুর মত, তারা একদিন সভয়ে বিস্ময়ে আকাশের পানে চেয়ে দেখ্‌ল, রূপালী পাখীরা আকাশ থেকে বড় বড় রূপালী ডিম ফেলে যাচ্ছে। এরোপ্লেন ও বোমার মধ্যস্থতায় চীনা চাষী ও জঙ্গী জাপানীদের প্রথম পরিচয়। বিদ্বেষের বীজ বোনা হ'ল, এবারে নতুন ফসল!

বুড়া লিংটান বোঝেনা কেন এই হিংসার পশরা নিয়ে বিদেশীরা আসে। তবুও জীবনের দাবী প্রবল, লিংটানের শিক্ষা সুরু হ'ল। পিতৃপিতামহদের কাছ থেকে লিংটান শিখেছে শান্তি ভাল, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব মহৎ; তাকে নতুন মন্ত্র নিতে বাধ্য করছে জীবন।

যে হাত কোনদিন মানুষের রক্তে কলঙ্কিত হয় নি, সেই হাত উদ্যত হ'ল জাপানী শত্রুকে অতর্কিতে গোপনে হত্যায়। লিংটানের জীবনের ভিতে ভাঙ্গন ধরল; সে তার ছেলেদের দিকে তাকায়, তাদের চোখে প্রতিহিংসার, বিদ্বেষের আগুন দেখে ভয় পায়। অতীতের নিশ্চল শান্তি—প্রশ্নহীন, ভাবনাহীন জীবন—ফসল বোনা ও কাটা তাকে পিছনে টানে। পার্লবাকের এই চিত্র—বেদনায় বিবর্ণ দুর্গতি ও হতাশার চিত্র, এর মধ্যে ভবিষ্যতের আশ্বাস নেই, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আক্ষেপই শুধু প্রবল। লিংটানের ছেলেরা অবশ্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে, গেরিলা যুদ্ধ সুরু করেছে। তবুও শিল্পী এখানে চীনা গণসংগ্রামকে প্রাধান্য দেননি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনাদের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেন নি। পার্লবাকের মানবতাবোধ ঠিক বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে নি, শিল্পীর কল্পনা-প্রবণত এখানে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আর এই জন্যই ড্রাগন সিডের শেষ অংশ অতি বিস্ময়কব ভাবে ব্যর্থ। প্রথম অংশে লিংটান ও লিংসাওয়ের পারিবারিক জীবনের ছবি পার্লবাক সহজস্বাচ্ছন্দ্যে এঁকে চলেছেন; আশ্চর্যের বিষয়, শেষ অংশে তিনি হলিউড ঢংএর রোমাঞ্চকব প্রেমের কাহিনী অবতারণা করে মূল আখ্যান থেকে সরে গেছেন—আমেরিকা থেকে আমদানী আধুনিকা চীনা তরুণীর সঙ্গে গেরিলা-সেনা-নায়কের (লিংটানের ছোট ছেলে) পূর্ব্বরাগ ও প্রণয়লীলা কাহিনীর বেদনাময় গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করেছে। সমস্ত উপন্যাসখানার এই অসংগতি দেখেই আরো মনে হয় যে উদার কল্পনাশক্তি ও লেখন ক্ষমতাই আর্টিষ্টের একমাত্র উপাদান নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে প্রতিভার অপচয় হতে বাধ্য।

পোলিশ লেখিকা ওয়াণ্ডা ওয়াসিলেস্কা স্বল্পকথার শিল্পী। ছোট কালির আঁচড়ে তার চিত্ররূপ গভীর অর্থপূর্ণ। রেনবোতে নাটকীয় ভাবোচ্ছ্বাসের প্রচুর প্রকাশ নেই—যদিচ সুযোগ যথেষ্টই ছিল। ওলেনা যখন জার্ম্মান ক্যাপ্টেনের জেরা ও জবরদস্তীতেও রুশ

গেরিলাদের গোপন আশ্রয় স্থলের খবর দিতে রাজী হ'ল না, তখন ক্যাপ্টেন ভয় দেখাচ্ছে যে তারি চোখের সামনে তার নবজাত শিশুকে হত্যা করা হবে। ক্যাপ্টেন বলছে, 'তুমি এখন মা হয়েছ মনে রেখো।' ওলেনার মনে পড়ল, গেরিলারাও তাকে মা বলে ডাকৃত, যখন বনের মধ্যে সে তাদের সঙ্গে ছিল। এই-ই যথেষ্ট। তারপর ওলেনা ও তার শিশুর মৃত্যু। রেনবো'র জার্মান ক্যাপ্টেন ও জার্মান সৈন্যরা নিষ্ঠুর বটে, তবুও তাদের মানুষ বলে চেনা যায়। তারা য়ুক্রেণের তুষারবিদ্ধ স্তব্ধতায় হাঁপিয়ে ওঠে, রুশগেবিলার অতর্কিত নৈশঅভিযানের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, দেশে ফিরে যাবার জন্য গোপনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে—ক্যাপ্টেন থেকে সাধারণ শান্ত্রী পর্যন্ত,—আর এই বিড়ম্বিত জীবনের বিস্বাদ দূর করার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠানে পৈশাচিক আনন্দ পেয়ে নিজেদের মন ভোলায়।

য়ুক্রেনের এই রুশ গ্রামবাসারা ও প'ল বাকের চীনা চাষীদের অনেক তফাৎ। এদেব চোখ চীনা লিংটানের মত অতীতের দিকে ফেরানো নয়, ভবিষ্যত সম্বন্ধে এরা সন্দোহকুল নয়। জারের আমলে এরা ছিল মজুবচাষী, তারপর বিপ্লব এনেছিল এদের জীবনে নতুন স্বাদ। নাৎসী বুটের তলায় সেই নতুন জীবন গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে ; নাৎসাদের উৎখাত করতে এদের মনে সংশয় নেই, কুণ্ঠা নেই, এরা এখনো ভোলেনি, এই ডনের দুই তীরে আরো একবার এরা লড়াই করেছিল বিপ্লবকে বাঁচাতে, কসাক জমিদার জেনারেলদের হাত থেকে। য়ুক্রেনের এই গ্রামে তাই রামধনু দেখা দেয় মুক্তির ইঙ্গিত নিয়ে—যে মুক্তির জন্য গ্রামের ছোট ছেলেটা থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সমস্ত নির্যাতন তুচ্ছ করে গেরিলাদের সাহায্য করেছে। এই মুক্তি যুদ্ধের কোন নায়ক নেই, গ্রামের প্রত্যেকেই নায়ক ও যোদ্ধা ; এই যুদ্ধে গণসংহতির সার্থক প্রয়াস। মুক্তি যেদিন এল, য়ুক্রেনের এই নামহীন গ্রাম থেকে জার্মান প্রভুত্বের উচ্ছেদ হ'ল সেদিনও দিগন্তে রামধনুর সপ্তবর্ণরঞ্জিত উজ্জ্বল রেখা। ড্রাগন সিডে চীনা গেরিলা যুদ্ধের বীজ বোনা হয়েছে, কিন্তু সে বীজ অন্ধ প্রবৃত্তির বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ মাত্র। তার রাষ্ট্রিক চেতনা

অস্পষ্ট, ভাবী মুক্তির কল্পনা ও বাস্তব প্রয়াসের মধ্যে কোন পরিষ্কার যোগসূত্র নেই—আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ভাবী আশ্বাসের রামধনু নেই। রেনবোতে আছে কল্পনা ও বাস্তবের মিলন সেতু।

'ফল্ অব প্যারিসে'র (প্যারিসের পতন) পরিধি আরো বিস্তৃত, তার ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশ আরো জটিল। প্যারিসের পতন ফ্রান্সের পতনের শেষ অধ্যায়। এহ্রেনবুর্গ গোটা ঐতিহাসিক যুগকে চিত্রিত করেছেন। ফ্রান্সের পরাজয় ও পতন এই শতাব্দীর একটা বিস্ময়কর বেদনাময় পরিচ্ছেদ। এখনও অনেকের মনে এই প্রশ্ন—রোবসপিয়ের ও নেপোলিয়নের ফ্রান্স, গামবেটার ফ্রান্স, কম্যুনের রক্তরঞ্জিত প্যারিস—যার ইতিহাসে পরাজয়ের অংসখ্য স্বাক্ষর থাকলেও দুর্বলতার, কাপুরুষতার চিহ্ন ছিল না—সেই ফ্রান্স কী করে এত সহজে হিট্লারের করায়ত্ত হ'ল। এই প্রশ্নের উত্তর যুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈন্য সমাবেশের মধ্যে খুজলে মিল্‌বেনা; ফ্রান্সের পতন ম্যাজিনো লাইনের পার্শ্বদেশ ভঙ্গে নয়, তার পতনের কারণ ফরাসী শাসকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা। ফ্রান্সের পতনের সুরু—স্পেনে, আবিসিনিয়ায় যখন থেকে লাভাল-চেম্বারলেন চক্র শ্রেণীস্বার্থের কাছে জাতীয় স্বার্থ-বলি দেবার 'তোষণ নীতি' প্রয়োগ আরম্ভ করে। ইতিহাসের দাবীই রাষ্ট্রিক নেতাদের স্বরূপ প্রকাশ করে—যখন ছিল ধনতন্ত্রের উন্নতির যুগ তখন রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি হ'ল ডিজরেলী, পামারষ্টন, ক্লেমাসঁ, জরে (Jaures); ধনিকস্বার্থ তখন স্বদেশ ও স্বরাজ্যের সীমানা প্রসারে অগ্রসর। ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ের ধনিকতন্ত্র যখন সঙ্কটের পর সঙ্কটে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তখন দেখা গেল শ্রেণীস্বার্থের উলঙ্গ প্রকাশ রাজনীতিক্ষেত্রে। ধনিক প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে—তাই মজুর শোষণ ও দমন এবং প্রভুত্ব রক্ষাই চেম্বারলেন দালাদিয়ের লাভালের মূলমন্ত্র। ধনিক অভ্যুদয়ের যুগে রাজ্যলোভী ক্ষমতাবিস্তার প্রয়াসী শাসকদের ছিল সুদৃঢ় ও সবল ব্যক্তিত্ব—যাকে না মান্‌লেও শ্রদ্ধা করা যায়। অবনতির যুগে রাষ্ট্রনেতারা অস্থিরচিত্ত সংগ্রামভীরু ব্যবসাদার—শ্রেণীস্বার্থের নগদ লাভ লোকসানের

খতিয়ানই তাদের রাষ্ট্রনীতির কম্পাস। ইলিয়া এহ্রেনবুর্গ এই শাসকশ্রেণীর পরিচয় দিয়েছেন—ফল্ অব্ প্যারিসে। এই পরিচয় একটানা একরঙা চিত্র মাত্র নয়। শাসক শ্রেণীর দুর্বলতা ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় কোন বাঁধা লাইনের বিশ্লেষণে সমাপ্ত নয়—সমাজের প্রতিস্তরে ব্যাধি বিস্তৃত হয়েছে অসংখ্য মানুষের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে এর অসংখ্য রকমের প্রকাশ। নানা মানুষের মনে নানা রকমের প্রশ্ন ও নানারকমের সমাধান। ফল্ অব্ প্যাবিসে তাই বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ, ঘাত প্রতিঘাত। পেশাদার রাজনীতিক, জনসংহতিতে বিশ্বাসহীন বৃদ্ধ সোস্যালিস্ট, ঘুষখোর মন্ত্রী, স্বদেশদ্রোহী জার্মান গোয়েন্দা ডেপুটী, বিবেকবুদ্ধিহীন সাংবাদিক—সকলেই ফ্রান্সকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে। তবুও এরা মানুষ—এরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, 'ফ্রান্সকে বাঁচাও ঈশ্বর', স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে, আবার মজুরদের ভয় করে, ঘৃণা করে, নাৎসী শাসন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হয়। জার্মানাব সঙ্গে যুদ্ধ এরা চায় না—যুদ্ধ যখন আপনা থেকেই এগিয়ে আসে তখন কারখানার মালিকেরা যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়াবীতে বিঘ্ন ঘটায়। জেনারল ও কম্যাণ্ডারেরা রাষ্ট্রনেতাদের বিশ্বাস করে না। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হয়েছে, ফরাসী জেনারেল ম্যাপ খুলে বসে আছেন রাশিয়ার, জার্ম্মানীর নয়! প্রাচীন রোম-গণতন্ত্রের অস্তগামী মহিমার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন লেখক বলেছিলেন, 'The world is so pretty but false', এহ্রেনবুর্গেব প্যারিস ও ঠিক তাই so pretty but false. কাফে ও রঙ্গশালার বিলাসলীলার বিশ্রাম নেই। আইন সভা বাক্‌যুদ্ধে সরগরম, মন্ত্রাদের আনাগোনা; শেয়ার বাজারে রাষ্ট্রনীতির ভাগ্য নির্ণয়; স্বদেশ? স্বদেশ কোথায়?—জার্মানীতে—ব্যাঙ্কও ব্যবসার মুখপাত্র ডরিও, মঁটিনি ম'গার তাই নির্দেশ দিচ্ছেন। জুয়াড়ী সম্পাদক জলিও কর্তাদের হুকুমে কলম চালাচ্ছেন—আজ হিট্‌লারের তোষণে কাল লাটিন ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে মুসোলিনীর পদলেহনে।

এহ্‌রেনবুর্গ এঁকে গিয়েছেন এইরকম অসংখ্য খণ্ডচিত্র—১৯৩৫এর ফ্রান্স থেকে ১৯৪০এর ফ্রান্স পর্যন্ত। ফ্রান্সের পতনের যে সব সাংবাদিক বর্ণনা ও বিবরণ বার হয়েছে সেগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় এহ্‌রেনবুর্গ ইতিহাসের উপর রং চড়ান নি—ফল্‌ অব্‌ প্যারিসের প্রত্যেকটী ঐতিহাসিক ঘটনাই সত্যতা দাবী করতে পারে।

তবুও এহ্‌রেনবুর্গ ঐতিহাসিক নন, কথাশিল্পী। একটা জাতির ভাগ্যবিপর্যয় নানাস্তরের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়ে কি ভাবে দেখা দেয় তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এহ্‌রেনবুর্গ কেবল ধনিক স্বার্থের কলঙ্কময় বিশ্বাসঘাতকতার ছবিই আঁকেন নি। একটা জাতির সমস্ত মানুষই ধনিক স্বার্থের কাছে দেশপ্রেমকে বলি দিচ্ছে এমন কোন অসম্ভব ধারনা করবার সঙ্গত কারন নেই। বৃদ্ধ ডেপুটি ফুরো প্রাচীনপন্থী লিবারেল, রোবসপীয়েরের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সমস্ত দলগত স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফুরো প্রতিবাদ করেছেন—নির্ভয়ে একলা। কমুনিষ্ট-বিদ্বেষী ডেপুটী ডুকেন আইন সভার নিস্ফল বাক্‌ যুদ্ধে হতাশ হয়ে স্বদেশরক্ষার যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে সহকর্মীদের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার চরম মূল্য দিচ্ছেন। ধনী ব্যবসাদার ডেসার মজুর শাসন ও শোষণে সিদ্ধহস্ত, মন্ত্রিসভার উত্থান পতন ঘটে তাঁর ইঙ্গিতে। ডেসার ফ্রান্সকে নাৎসী মডেলে গড়তে চান্‌ না; মজুর ও মালিকের শ্রেণীযুদ্ধ চলুক ফ্রান্সের চিরাচরিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে; ডেসার নাৎসী আদর্শের কাছে ফ্রান্সের গণতন্ত্রকে বিক্রয় করতে রাজী নন। মালিক ও মহাজনদের সভায় ডেসারের পরাজয় হ'ল নাৎসীতোষক ডরিও, মাঁটিনি, মগারের চক্রান্তে। ডেসারের ফ্রান্স—মালিক ও মজুরের স্বাধীন প্রতিযোগিতার ফ্রান্স, ছোট ব্যবসাদার ও চাষীর ফ্রান্স। নাৎসী প্রভুত্ব এই ফ্রান্সের মৃত্যু ঘোষণা করে। ডেসারের জীবনের তাই প্রয়োজন ফুরাল। ডেসার আত্মহত্যায় ফ্রান্সের আত্মবিক্রয়ের গ্লানি ভুল্‌লেন।

এহ্‌রেনবুর্গের এপিক শুধু শাসক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যর্থতার বর্ণনায় সম্পূর্ণ নয়। ডেসার ও ডুকেনের বাঁচবার প্রয়োজন

ফুরিয়ে যায় কারণ বর্তমানের ব্যর্থতাই তাদের কাছে একমাত্র সত্য তাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত নয়।. যারা স্পেনে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচ্ছেদ থেকে লড়াই সুরু করেছে ধনিক স্বার্থের স্বদেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে, সেই মজুর শ্রেণীর রক্তাক্ত ইতিহাসে পরাজয় আছে, কিন্তু সংগ্রামের ক্ষান্তি নেই,—বিশ্বাসহীনতা নেই, ব্যর্থতা নেই। ম্যাড্রিডের সীমানায় যারা ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্টদের রুখ্‌তে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই ফরাসী মজুর বীরেরাই ফ্রান্সের দুর্দিনে সংঘবদ্ধ হয়েছে স্বদেশ রক্ষায়। পপুলার ফ্রণ্টের ফাটল থেকে ফ্রান্সের পরাজয় পর্যন্ত মজুর সংহতির ইতিহাস আঁকা আছে ফল্‌ অফ্‌ প্যারিসে। এর সঙ্গে জড়িয়ে মজুর জীবনের ব্যক্তিগত মিলনবিরহ, সুখ দুঃখের ইতিহাস। এহ্‌রেনবুর্গ কাউকে বাদ দেন নি, অবজ্ঞা করেন নি—ধনিকের নির্যাতনে ক্লান্ত পরাজয়ভীরু মজুর থেকে দৃঢ়চিত্ত সংগঠন কর্মী পর্যন্ত। কম্যুনিস্ট কর্মী মিশ', এঞ্জিনিয়ার পিয়ের ক্লদ্‌ আর্টিষ্ট আঁদ্রে ও পিয়েরের স্ত্রী আগ্‌নেস প্রত্যেকের ভাগ্যই জড়িয়ে আছে ফ্রান্সের এই দুঃখদগ্ধ কলঙ্কিত ইতিহাসের সঙ্গে। বিশুদ্ধ আর্টিষ্ট আঁদ্রেকেও ঠেকে ঠেকে শিখতে হচ্ছে যে রাজনীতির অঙ্গন থেকে দূরে থাকলেও ভুলে থাকা যায় না; স্বামীর রাজনৈতিক কর্ম প্রয়াসে বিরক্ত ঘরের শান্তি পিপাসী আগ্‌নেসকে ও অবশেষে নেমে আস্‌তে হচ্ছে যুদ্ধের অঙ্গনে। সভ্যতার চরম সঙ্কটে গণচিত্তের বিক্ষোভ রাজনৈতিক চেতনার বলিষ্ঠরূপ নিচ্ছে, পথ প্রশস্ত হচ্ছে, পদক্ষেপ দৃঢ় হচ্ছে। তাই পরাজয়ের অগৌরবের মধ্যেও আশ্বাস আছে, ভাবীমুক্তির ইঙ্গিত আছে। জার্মাণ কর্ণেল যখন আগ্‌নেসকে ভয় দেখিয়ে বল্‌ছে 'This is the end of you' যে আগ্‌নেস একদিন তার স্বামীর রাজনীতি-প্রীতিকে বিদ্রূপ করেছে সেই আগ্‌নেসই নির্ভয়ে উত্তর দিচ্ছে—'Not of France. And it is not the end. There is no end'.

১৩৫২

গ্যেটে

তাজমহল আমরা অনেকেই দেখিনি তবু সাজাহানের স্বপ্নসৌধ তাঁর স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে আমাদের কাছে; বেঠোফেনের চন্দ্রালোক গীতিকা ও ঝড়ের সঙ্গীত আমরা অনেকেই শুনি নি, কিন্তু বেঠোফেনের নাম আমাদের অজানা নয়। তেমনি গ্যেটের মহাকাব্য ফাউস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্ভবতঃ আমাদের অনেকেরই নেই, তবুও দুই শতাব্দী ও সাত সমুদ্রের ব্যবধান পার হয়ে এসেছে আমাদের কাছে গ্যেটে-প্রতিভার খ্যাতি। শিল্পের কল্পলোকে সীমান্তের মামলা নেই; কত স্বল্পপরিচয়েও কত গভীর অন্তরঙ্গতাবোধ। যে ইংল্যাণ্ডকে আমরা সহজে ভালবাসতে পেরেছি সে ইংল্যাণ্ড হচ্ছে সেক্সপীয়র, শেলী, ব্রাউনিং, বার্ণার্ড শ-এর; তেমনি জার্মাণীকে আমরা জানি গ্যেটে বেঠোফেনের দেশ বলে। ফাউস্টের রূপক কাহিনীর সঙ্গে নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মিলিয়ে গ্যেটে যে জীবনদর্শন রচনা করেছিলেন তার সার্থকতা আজ আর তত স্পষ্ট নয় হয়ত। ফাউস্ট এবং হেবর্টর কালপ্রবাহে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। তবু গ্যেটের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়নি যেমন হয়নি মিল্টন ও দান্তের। যদিও 'প্যারাডাইস লষ্ট' আর 'ডিভাইন কমেডি'র রস এখন অনেকের পক্ষেই উপভোগ করা কঠিন।

গ্যেটে সম্বন্ধে সাজাহানের মত একটি মাত্র অভিনন্দনই নিঃসংশয়ে দেওয়া চলে, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' গ্যেটের বিচিত্র জীবনই এক মহাকাব্য—তাঁর ফাউস্ট, হেবর্টর, ভিলহেলম মাইস্টার, প্রমেথিউস, গোৎস, ইথিগেনিয়া, তাসো, হেরমান ও ডোরেথিয়া ও এই জীবনকাব্যেরই এক একটা সার্থক মুহূর্ত। গ্যেটের জীবনকাব্যের কত না বিচিত্র বর্ণলীলা, কত সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও কর্মের উন্মাদনা, আবার ওতেই অদ্ভুতভাবে মিশেছে কত না ভালো মন্দ সংস্কার ও

আবেগের প্রেরণা। এরফুটে নেপোলিয়ন যখন গোটেকে দেখেন তখন শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'এই একটি মানুষ।' মানুষই বটে। নেপোলিয়নের মতই সাধারণের মানুষ আবার আত্মপ্রতিষ্ঠায় অতি অসাধারণও।

ইউরোপের সমাজজীবনে ১৬ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত নবজন্মের যে বেদনা ও বিক্ষোভের বন্যা বয়েছিল গ্যেটের প্রতিভা তার মাঝে থেকেও তার ঊর্ধ্বে। ফরাসী বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া যখন জার্মাণীর ডিউক, প্রিন্সদের দুর্গপ্রাচীরে আছড়ে পড়ছে তখন গ্যেটে ঝড় ও ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছেন, বলেছেন, 'আমার রাজত্ব ঊর্ধ্বাকাশে।' বাইরণকে ভালবেসেও গ্যেটে মানতে পারেন নি তাঁর বিদ্রোহপ্রবণতা। নেপোলিয়নকে শ্রদ্ধা করেও গ্যেটে স্বীকার করেন নি নেপোলিয়ানের নিদেশ—'এযুগের নিয়তি হচ্ছে রাজনীতি।' গ্যেটে যে নীতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের আত্মোপলব্ধির ও আত্মপ্রকাশের নীতি। তাঁর ভিলহেলম মাইস্টারকে তাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—'Remember to live' (Sorrows of Werther) 'ভের্টারের দুঃখ' বাঁচবার কথা মনে রেখো।

গ্যেটে বেঁচেছিলেন ৮৩ বৎসর আর যতদিন বেঁচেছিলেন জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উপরেই উঠে চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত, গান্ধীজীর মত, শ-এর মত গ্যেটেরও বুদ্ধির দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল শেষ দিন পর্যন্ত। আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্তে তাঁর সেই চিরস্মরণীয় উক্তি, জানালা খুলে দাও, আরো আলো, আরো আলো চাই। প্রকৃতিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা ছিল প্রকৃতির মত হবার। প্রকৃতির মত উদাসীন, আবার প্রকৃতির মতই অজস্র সৃষ্টির আনন্দে আত্মগত—গ্যেটে প্রতিভার এই হ'ল মূল সুর। এর ফলে অবশ্য গ্যেটের শিল্পসাধনা ও জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে।

ফরাসী মনীষী এমিয়েল বলেছিলেন, প্রকৃতির মত উদাসীন.

অকৃত্রিম হতে গিয়ে গ্যেটে জগতের দুর্বল, বঞ্চিত, নিপীড়িতদের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন নি। তিনি অনুশীলন করেছিলেন গ্রীকদের মত নিস্পৃহতা। ভলতেয়ারও বেঁচেছিলেন আশী বৎসর আর এই দীর্ঘকাল তিনি কাটিয়েছিলেন প্রাচীন স্বেচ্ছাতন্ত্রের কয়েদখানার পাথর একটীর পর একটী করে খসিয়ে ফেলতে। রাজা ফ্রেড্‌রিকের পারিষদরূপে ভলতেয়ারকে দেখা গিয়েছিল বটে একবার, কিন্তু ফ্রেড্‌রিকের রাজকীয় দম্ভে চরম আঘাত করেই ভলতেয়ার ফিরে এসেছিলেন তাঁর আপন মহিমার ক্ষেত্রে। গ্যেটে পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়েছিলেন হ্বাইমারের রাজসভায়। তাতে তাঁর মহিমা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়নি। চাটুকারিতায় তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না, হ্বাইমারের রাজ-অমাত্যরূপে তাঁর দায়িত্ববোধ নানা মহৎ কর্মের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল ? স্বৈরাচারকে তিনি শ্রদ্ধা করেননি ; তাই নেপোলিয়নের কাছে জার্মাণ ডিউক, প্রিন্সদের পরাজয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হননি। নেপোলিয়নের উদার শাসননীতি তাঁর কাছে মঙ্গলকর মনে হয়েছিল। তবুও জার্মাণীর স্বদেশ প্রেমিকদের কাছে গ্যেটের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

জেনায় যখন ফরাসী কামান গর্জন শোনা যাচ্ছিল গ্যেটে তখন উদাসীন আবার জার্মাণীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকেও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এর জন্য অবশ্য গ্যেটে প্রতিভাকে দোষ দেওয়া যায় না। জার্মাণীকে তিনি ভালবাসতেন ঠিকই, কিন্তু নেপোলিয়নের উদারনীতি ও উদ্যম তাঁর চিত্তজয় করেছিল ; আর কর্ণেই, রাসিন, রুশোর পীঠভূমি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারেও তাঁর উৎসাহ ছিল না। গ্যেটে যে বিশ্বজনীন প্রেমের আদর্শ বহন করেছেন তার মূলে হয়ত ছিল শিল্পীর নির্লিপ্ততা। ব্যক্তির সুস্থ আত্মবিকাশের দাবীকেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া, যুদ্ধের জয়পরাজয় তাঁর কাছে অবান্তর ছিল। এই কারণেই ভলতেয়ার যেখানে আঘাত করতে দ্বিধা করেননি, গ্যেটে সেখানে উদাসীন থাকতে পেরেছেন। তাঁর বিশ্ববোধ কেবল দেশ ও জাতির ঊর্ধ্বে নয়, সমাজের সমস্ত জটিল সংঘাত ও বিরোধেরও বহু ঊর্ধ্বে। গ্যেটের বহুমুখী সৃজনী প্রতিভার

অনুরক্ত হয়েও বেঠোফেন তাই গ্যেটের নির্বিরোধ রক্ষণশীল জীবন দর্শনকে সমর্থন করতে পারেননি।

একই যুগের শিল্প প্রতিভার তুই বিরাটস্তম্ভ বেঠোফেন ও গ্যেটে। বেঠোফেনের বুকভরা তুকুলপ্লাবী বিপ্লবের উদ্দামতা ; গ্যেটের অনুভূতি হ্রদের গভীর জলের মত প্রশান্ত, চিরস্থির। যৌবনের প্রমেথিউসকে অতিক্রম করে গ্যেটে সহজেই আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন, ওলিমপাসের চূড়ায় দেবরাজ জুপিটারের মত! নেপোলিয়নের অভিষেক সংবাদে বেঠোফেন ক্ষোভে অধীর হয়েছিলেন। জার্মাণীর বুকে নেপোলিয়নের বিজয় পতাকায় গ্যেটে প্রগতিরই সূচনা দেখেছিলেন। অন্ততঃ তখনকার খণ্ড বিচ্ছিন্ন সামন্তরাজশাসিত জার্মানী সম্বন্ধে গ্যেটের এই ধারণা অন্যায় হয়নি। গ্যেটে ও বেঠোফেনের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে ইউরোপেব সেই যুগান্তকালের আদর্শ সংঘাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে গ্যেটে প্রতিভার বিশেষ একটি লক্ষণও পরিস্ফুট হয়।

গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক অনেকে অভিযোগ করেছেন, তিনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। সে অভিযোগ যুক্তিসহ নয়। রুশোব স্বভাব-বাদ ও ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্য গ্যেটেকেও অভিভূত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবেব উত্তাপ তাঁকে স্পর্শ কবেছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে কক্ষচ্যুত করতে পাবেনি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজের জীবনে বিপ্লবের সৃষ্টি বিনাশের রূপ যে আধ্যাত্মিক সংকট সৃষ্টি করেছিল গ্যেটের জীবনে সে রকম কোনো সঙ্কট দেখা দেয়নি। গ্যেটে বিপ্লবের রুদ্ররূপকে অভিনন্দিত করেন নি, রাষ্ট্রিক পবিবর্তনের চাইতে ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের দাবীর উপরই জোর দিয়েছেন। ইউবোপের সেই ভাঙ্গাগড়ার যুগসন্ধিক্ষণে যারা বিপ্লবের আতিশয্যে বিরাগী হয়ে নূতন সমন্বয় সন্ধান করছিলেন, হ্বাইমারের কবি-সাধক সহজেই তাঁদের মন্ত্রদ্রষ্টা হতে পেরেছিলেন। গ্যেটে-সুহৃদ বেঠোফেন অবশ্য গ্যেটের এই নিরুত্তাপ আত্মপ্রতিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি।

অষ্ট্রিয়ার এক সহরের রাজপথ ধরে একদিন বেঠোফেন ও গ্যেটে

চলে'ছন। এমন সময়ে রাজপরিবারের আবির্ভাব হল যথোচিত সমারোহে। বেঠোফেন জানিয়ে দিতে চান রাজমর্যাদার চাইতেও শিল্পী স্রষ্টার মর্যাদা বড়। গ্যেটে সসম্ভ্রমে টুপি খুলে রাস্তা ছেড়ে দিলেন, আর বেঠোফেন সগর্বে টুপি মাথায় দিয়ে বুকের উপর হাত রেখে রাস্তার মাঝ দিয়ে চল্লেন। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী বেঠোফেনকে অভিবাদন করলেন। বেঠোফেন যেমন গ্যেটের রাজানুরক্তি পছন্দ করেন নি, গ্যেটেও তেমনি বেঠোফেনের উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সমর্থন করতে পারেন নি। গ্যেটের প্রতি অবশ্য এবিষয়ে কিছু অবিচার করা হয়েছে। হ্বাইমারের রাজসভায় গ্যেটে যে মর্যাদা পেয়েছেন তার মূলে ছিল তাঁর সবল ব্যক্তিত্ব ও বিরাট প্রতিভা। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মর্মান্তিক সংঘর্ষের সেই যুগে গ্যেটে নিজেকে সমস্ত বিসম্বাদের ঊর্ধ্বে রাখতে পেরেছিলেন। কেমন করে এটা সম্ভব হয়েছিল তার রহস্য গ্যেটে প্রতিভার মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তাঁর 'তাসো' নাটকের লিওনোরার মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন, প্রতিভার বিকাশ নির্জনতায়, চরিত্রের গঠন ও বিবর্তন সংসারের অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে।

গ্যেটের বিচিত্র জীবনের দীর্ঘ পথে প্রতিভার ও চরিত্রের অদ্ভুত মিলন-বিচ্ছেদের রেখা আঁকা রয়েছে। গ্যেটের অনুরাগী অনেকেই এক সময়ে তাঁর জীবনদর্শনকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করেছেন। গ্যেটের বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় জীবনের চাইতে, তাঁর কাব্যৈশ্বর্যের চাইতে গ্যেটেতত্ত্বকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। ফাউস্টের কাব্যকল্পনা মহৎ, কি তত্ত্বকথা মহৎ, এই তর্কের কাল হয়ত বহুদিন উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্যেটের চরিতকার তাই বলেছেন, গ্যেটের খ্যাতি অক্ষুন্ন থাকলেও তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা কমেছে। এর কারণ অবশ্য গ্যেটে-প্রতিভার কোনো বিশেষ অসঙ্গতি নয়। গ্যেটের জীবনদর্শনে যে সব সমস্যার সমাধান ছিল, পথসংকেত ছিল কালের অনিবার্য গতিতে সেইসব সমাধান ও সংকেতের মূল্য ক্ষীণ হয়ে গেছে। এরজন্য ক্ষোভের কারণ নেই। ইউরোপের নবমানবতার উদ্বোধনে গ্যেটে বলেছিলেন তাঁর ফাউস্টের

মুখ দিয়ে—আদিতে ছিল কর্ম। সেই কর্মের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে জীবনের ধারা যুগ থেকে যুগে প্রবাহিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্যেটের ভিলহেলম মাইস্টারের শিল্পাদর্শের অনুকরণে লেখা রম্যাঁ রলাঁর জঁ। ক্রিস্তফের মুখেও গ্যেটের কথার প্রতিধ্বনি—আদিতে ছিল কর্ম। জঁ। ক্রিস্তফ্ শিশু পৃথিবীকে কাঁধে নিয়ে যে নদী পার হয়েছিল সেই জীবন্ত জলধারা হল চিরপ্রবহমান জীবন। গ্যেটেও ইউরোপের এক যুগসন্ধিক্ষণে পৃথিবীকে কাঁধে নিয়েছিলেন। গ্যেটের যুগ ইউরোপের সামন্ত সভ্যতার অন্তিম যুগ। সেই যুগের ভাঙ্গাগড়ার আধ্যাত্মিক সঙ্কটে গ্যেটে এনেছিলেন আত্মোপলব্ধির জীবন-দর্শন। ফরাসী বিপ্লবের উদ্দাম আবেগে যখন ভাঁটা পড়ল, যখন শেষ হতে গেল বাইরণের যুগ, গ্যেটে প্রতিভার প্রভাব তখনই সুরু হতে পেরেছিল। গ্যেটে পেরেছিলেন বিপ্লবের ধ্বংস ও সৃষ্টি দুই বিরোধী ধারাব সমন্বয় করতে। হ্বাইমাবের কবি সাধকের কাছে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাইরণ এবং স্কট দুজনেই—একজন উগ্র বিদ্রোহ-প্রবণ আর অন্যজন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের চারণ। ইউরোপের চিত্ত বিক্ষোভকে সংযত করবার জন্য গ্যেটের প্রয়োজন ছিল। গ্যেটে হয়েছিলেন নূতন ও পুরাতনের মিলনসেতু। গ্রীক হেলেন ও রোমান্টিক ফাউস্টের আত্মিক মিলনের মধ্যে গ্যেটে দিলেন ইউরোপের নূতন মানবিকতার সংযত সংহত রূপ। কবির মানসলোকে এই সমাধান হয়ত বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াই। কিন্তু বাস্তবেও বিপ্লবের উদ্দাম আবেগ ও উগ্র ব্যক্তিত্ববাদকে নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধবার আয়োজন চলেছিল। 'Close your Byron, open your Goethe'—বাইরণ বন্ধ কর, গ্যেটেকে স্মরণ কর,—কার্লাইলের এই নিদেশ বিপ্লবোত্তর সংহতির যুগের দাবী ছিল। একই কারণে গ্যেটের সংযত ভাবগম্ভীর জীবনদর্শনকে শেলী ও বাইরণের রোমান্টিক স্বপ্নচারণের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ম্যাথু আর্ণল্ড। গ্যেটের জীবন দর্শনের প্রেরণা হল আত্মস্থ হবার। স্পিনোজার মত তিনি ব্রহ্মবাদী। কান্টের অজ্ঞেয় সত্তাও তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু অতীন্দ্রিয় কল্পনাবিলাসের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা দেখেন নি।

তাঁর জীবনদর্শনের প্রেরণা হল কর্ম ও জ্ঞানযোগের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি ও ব্যক্তিত্বের অনুশীলন। গ্যেটে ছিলেন একাধারে কবি, শিল্পী, রাষ্ট্রশাসক ও বিজ্ঞানী। গ্যেটের জীবন-দর্শন কর্মসম্পর্কহীন অলৌকিক অধ্যাত্মসাধনাকে প্রশ্রয় দেয় নি। আশ্চর্যের কথা বৈকি গ্যেটে নিজের কাব্য সাধনার চাইতে তাঁর বিজ্ঞান চর্চাকেই সার্থকতর মনে করেছেন। জীব-বিজ্ঞানে বিবর্তন রীতির আবিষ্কারে তিনি ডারুইনের পূর্বগামী, আলোক রশ্মিতেও তাঁর সন্ধান প্রচেষ্টার সীমা ছিল না।

'আদিতে ছিল কর্ম' নব মানবিকতার এই বাণী গ্যেটের কর্মে এবং কল্পনাতেও। ক্রোচে বলেছেন, গ্যেটে আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক সেও এই অর্থে। কবি-সাধকদের সচরাচর যা হয়, সেই রকম ভাগবত শক্তিতে বিশ্বাস গ্যেটেকে কোন অপার্থিব জগতে টেনে নিয়ে যায়নি। যুক্তিবাদ তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে নি বটে, কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসকেও তিনি অসুস্থ আত্মকেন্দ্রিক মনে করেছেন। আধুনিকতার প্রতীক রূপেই তিনি বল্‌তে পেরেছিলেন অবনতির যুগে সাহিত্য উচ্ছ্বাস প্রবণ, উন্নতির যুগে বস্তুকেন্দ্রিক। গ্যেটের এই বস্তুকেন্দ্রিকতা কিন্তু সংকীর্ণ বাস্তবতা নয়। তাঁর উদার বুদ্ধি ও প্রখর কল্পনা বিশ্বজনীনতার ভাবীরূপ লক্ষ্য করতে পেরেছিল। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার যুগেও 'তিনি জার্মাণ জাতিকে বলতে সাহস করেছিলেন 'সারা পৃথিবীর নাগরিক হবার ব্রত হোক জার্মাণের।' সারা পৃথিবীকে দেখেছিলেন তিনি 'বৃহত্তর পিতৃভূমিরূপে' ('expanded fatherland')। এই উদার বিশ্ববোধকে স্মরণ করে ব্রাণ্ডেস বলেছিলেন, গ্যেটে হচ্ছেন মানবতার শ্রেষ্ঠতম প্রতীক (incarnation of humanity at its loftiest). গ্যেটের জীবনদর্শনকে তত্ত্ব হিসাবে প্রধান্য দিলে তাঁর বিরাট প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়। ফাউস্ট থেকে যাঁরা তাঁর জীবনদর্শনের পরম সত্য সংগ্রহ করতে চেয়েছেন তাঁরা শিল্পসৃষ্টির জটিল ও বিচিত্র প্রকাশরীতিও ঠিকমত উপলব্ধি করেননি। রবীন্দ্রনাথের মত গ্যেটেও সাবধান করেছেন, তাঁর কাব্যে তত্ত্বের সন্ধান করা বিড়ম্বনা।

ফাউস্ট কি স্বর্গ থেকে মর্ত্য, মর্ত্য থেকে নরক পর্যন্ত মানবাত্মার নিরুদ্দেশযাত্রা? অথবা ফাউস্টে কি পাপ পুণ্যের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের চিরবিজয়ী আত্মার উর্ধ্বগতি বর্ণনা করা হয়েছে? গ্যেটে তাঁর 'বসওয়েল' একারম্যানের কাছে বলেছিলেন, ফাউস্টের মধ্যে কোনো সর্বজনীন আইডিয়ার সন্ধান করা বৃথা। বিচিত্র প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতার ধারা কবির কল্পনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে ফাউস্টে। গ্যেটের জীবনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে আছে ফাউস্টের দুই খণ্ড। ফাউস্ট গ্যেটে নয়, কিন্তু প্রাচীন কাহিনীর যাদুবিজ্ঞানী ফাউস্ট গ্যেটের কল্পনাতে দেখা দিয়েছে গ্যেটের মানসপুত্ররূপে। ফাউস্টের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের রূপকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে গ্যেটের জ্ঞান পিপাসা ও আত্মোৎকর্ষের সাধনা, বিজয়ী আত্মার সমাহিত প্রশান্তি। ফাউস্ট গ্যেটের অন্তর্জীবনের কাব্যরূপ মাত্র নয়, জার্মাণীর জাতীয় কাব্যও বটে, আর সারা ইউরোপের মানবতাবোধের নবসংহিতা। দান্তে যেমন মধ্যযুগের ধর্মবুদ্ধির মন্ত্র দ্রষ্টা, গ্যেটে তেমনি আধুনিক ব্যক্তিত্ববাদের সাধক। এই ব্যক্তিত্ববাদের সর্বনাশারূপ বাইরণে, সংহত প্রশান্ত স্থিতিশীল রূপ গ্যেটের মহাকাব্যে।

ইউরোপের রেনেসাঁসের চূড়ান্ত ফল গ্যেটে। সেই কারণেও হয়ত গ্যেটের কাব্যে তত্ত্বদর্শনের ঝোঁক বেশী। ইটালীতে, চিত্রে ভাস্কর্যে ও সঙ্গীতে ধর্মতন্ত্রের শাসন থেকে সৌন্দর্যের মুক্তি হ'ল পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায়। ইংলণ্ডে নবমানবতার প্রতিষ্ঠা হ'ল কাব্যে কল্পনার অবাধ অভিযানে। আর জার্মাণীতে এল ধর্মানুশাসনের বিরুদ্ধে চিন্তাবিপ্লব। লিওনার্ডো, সেক্সপীয়র, লুথার—সৌন্দর্য, কল্পনা ও চিন্তার বন্ধন মুক্তির এই তিন দিক্‌পাল ইউরোপের নব জন্মের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন গ্যেটে তারই উত্তরাধিকারী। ইটালীর সৌন্দর্য সাধনা, ইংলণ্ডের প্রাণময় কবিকল্পনা ও জার্মাণীর ধর্মনৈতিক সংস্কারবাদ—রেনেসাঁসের এই তিন ধারাই গ্যেটে প্রতিভায় মিলিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু গ্যেটে সইতে পারেন

নি সেক্সপীয়রের অবাধ কল্পনা প্রবণতাকে। শৃঙ্খলাবোধই গ্যেটের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রাচীন গ্রীক আদর্শের দিকে। উপরন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ত ছিলই। প্রতিভার স্বকীয়-তার দিক থেকে এই সংযমের ফল গ্যেটের পক্ষে মঙ্গলকর হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর জন্যই গ্যেটের কাব্য সাধনা সেক্সপীয়রের পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

শিল্পীর নির্লিপ্ততা সেক্সপীয়রেরও ছিল। কিন্তু ছিল না তত্ত্বের প্রবণতা; যুগধর্মের সঙ্গে সেক্সপীয়রের যোগ হৃদয়ের, বুদ্ধির কিন্তু ছককাটা তত্ত্বের নয়। সেক্সপীয়রে তাই জীবন—যে জীবনের প্রবাহে পরিবর্তন আছে, পরিসমাপ্তি নাই। আর গ্যেটেতে জীবন দর্শন যে দর্শন কাল চিহ্নিত। গ্যেটের নির্লিপ্ততা তত্ত্বের সামগ্রী—ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী তার মূল কথা। সেক্সপীয়র যে নির্লিপ্ততার সাধনা করেছেন তারে মূলে কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। জীবনের জটিল গভীর অনুভূতিগুলিকে তিনি কোথাও মত ও পদ্ধতির ছকে বাঁধেন নি, রূপায়িত করেছেন শিল্পীর উদার নিরপেক্ষ রীতিতে। গ্যেটের বিরাট কাব্য প্রচেষ্টার আদি মধ্য অন্ত শেষ পর্যন্ত গ্যেটের ব্যক্তিত্বই প্রবল। সেক্সপীয়রের কাব্য প্রতিভা নৈর্ব্যক্তিক। ফলে গ্যেটের জীবন দর্শন কালধর্মে তার সার্থকতা হারিয়েছে অনেকখানি, আর সেক্স-পীয়রের জীবনসাধনার শিল্পরূপ প্রাণবন্ত রয়েছে এখনও; ম্যাকবেথের সঙ্গে ফাউস্ট, কি হ্যামলেটের সঙ্গে হের্বেরের দুঃখের তুলনা করলেই কল্পনা ও তত্ত্ব, জীবন আলেখ্য ও জীবনদর্শনের মূল্য বিচার করা যেতে পারে।

ক্রোচে হয়ত এই জন্যই মন্তব্য করেছেন যে, সাহিত্যের ইতিহাসে ক্রমবিকাশের ধারায় গ্যেটের স্থান নির্ণয় করা যায় না। গ্যেটের কাব্য-সাধনা গ্যেটেতেই পরিসমাপ্ত। গ্যেটে প্রতিভার অনন্যসাধারণতা কেবলমাত্র তাঁর কাব্যে নয়, দীর্ঘ জীবন-সাধনার পর্বে পর্বেও প্রতিফলিত হয়েছে। সেক্‌সপীয়রের জীবনকে

তাঁর কাব্যের সঙ্গে সংযুক্ত না করলে চলে। গ্যেটের জীবন ও কাব্য একই সূত্রে বাঁধা। হ্বের্টর, ফাউস্ট, ভিলহেলম মাইস্টার গ্যেটের জীবনসাধনারই স্বীকারোক্তি। শকুন্তলা নাটকের মহৎ আদর্শ সম্বন্ধে গ্যেটে যে প্রসিদ্ধ উক্তি করেছিলেন, তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধেও সেই উক্তি যথার্থ। শকুন্তলায় তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল স্বর্গ ও মর্ত্য একত্রিত হয়েছে, গ্যেটে বলেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনসাধনার ও মূল সুরটি এই। লুডভিগ মন্তব্য করেছেন, গ্যেটের জীবন হল ভাল এবং মন্দের, পাপ ও পুণ্যের সংগ্রামের ইতিহাস। লুডভিগের মন্তব্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে মনে হয়।

গ্যেটে জীবনরসিক, ফাউস্টের মতই তত্ত্বের সঙ্গে হৃদয়াবেগের, কর্তব্যের সঙ্গে অনুভূতির প্রবল দ্বন্দ্ব চলেছে তাঁর দীর্ঘ জীবন ধরে। এই দ্বন্দ্বই প্রেরণা দিয়েছে তাঁর অজস্র কাব্য, গীতি-কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকের। অনেকখানি জুড়ে আছে গ্যেটের বিচিত্র প্রণয় কাহিনী। নিন্দুকের রসনা এর জন্য মুখর হয়েছিল বটে। কিন্তু গ্যেটে হৃদয় দেওয়া নেওয়ার পর্বে খেলা করেন নি। তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে বহু রহস্যময়ী নারীর প্রেরণা কাব্যের নির্ঝর উন্মুক্ত করেছে। পনের বৎসর বয়সে ফ্রাঙ্কফুর্টে যে প্রণয়িণীর প্রতি অনুরাগে হৃদয় উদ্বেল হয়েছিল ফাউস্টে তার নাম গ্রেটখেনরূপে অমর হয়ে আছে। পরের বৎসর লাইপৎসিগে আনা ক্যাথেরিনার রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্যেটে রচনা করেন 'খেয়ালী প্রেমিক'। কুমারী ফন ক্লেটেন-বার্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তরুণ গ্যেটের হৃদয়াবেগকে সংযতই করেছিল। তাঁর মধ্যস্থতায় গ্যেটে আলকেমী শাস্ত্রচর্চায় কৌতূহলী হন। ফন ক্লেটেনবার্গের পবিত্র মধুর সঙ্গই বর্ণিত হয়েছে ভিলহেলম মাইস্টারের 'সুন্দর আত্মায়'। ফ্রাঙ্কফুর্টে লিলির চপল তারুণ্য প্রেরণা দেয় 'স্টেলা' এবং এরভিন' গীতিনাট্যের। স্ট্রাসবুর্গে এমিলিয়া ও লুসিডার অদ্ভুত উচ্ছ্বাসময় প্রেমের অভিশাপ

সারাজীবন গ্যেটের হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। এই বিচিত্র প্রণয়-লীলার মধ্যে যাকে গ্যেটে সত্যই গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন সেই ফ্রেডেরিকার মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্য তাঁর জীবনে এনেছিল বসন্তের প্রাচুর্য। ফ্রেডেরিকারই চিত্রিত হয়েছে ফাউস্টের মার্গা-রেটে এবং গ্যেটের আরও বহু নায়িকার মধ্যে। বেটিনার ব্যর্থ প্রেমনিবেদন গ্যেটের দুঃখের কারণ হয়েছিল কিন্তু কাব্যের প্রেরণা দিতে পারেনি। মিনা হার্তসলিব এসেছিলেন গ্যেটের সনেটগুচ্ছের প্রাণ সঞ্চার করতে। মিনার প্রতি গ্যেটের প্রেম-নিবেদন ব্যর্থ হলেও এর ফলে গ্যেটের প্রতিভা নূতন শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিল।

নরনারীর স্বেচ্ছামিলন সম্পর্কে Elective Affinities-এ গ্যেটে এক বিরাট দুঃসাহসিক কাহিনী রচনা করেছিলেন। এই উপন্যাস গ্যেটের নিজেরই বেদনাময় অভিজ্ঞতার ভস্মাবশেষ। হেরমান ও ডোরোথিয়ায় গ্যেটে এঁকেছেন প্রেম ও মিলনের শান্ত আনন্দময় চিত্রঃ Elective Affinities-এ দেখিয়েছেন হৃদয়াবেগের সংকটময় দিক। গ্যেটের সারাজীবন ধরেই চলেছে প্রণয়ের পরীক্ষা ও সংকট—২৬ বৎসর বয়সে ফ্রেডেরিকার প্রতি অনুরাগ থেকে ৭৬ বৎসর বয়সে উলরিকার প্রেমে বিহ্বলতা পর্যন্ত। এই নিরবিচ্ছিন্ন প্রণয়াবেগের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানা ও শার্লেট দুজনে গ্যেটের জীবন ও প্রতিভাকে সমৃদ্ধ করেছে লীলাবধূ ও আত্মাবধূরূপে।

গ্যেটের জীবন-সাধনা একটি যুগেরও পরিচয়। ফরাসী বিপ্লবের ঝড় ও ঝঞ্ঝা তরুণ গ্যেটের জীবনেও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। 'হ্বের্টরের দুঃখ' গ্যেটের নিজেরও। হ্বের্টর ব্যর্থ প্রেম ও পরাজিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার যাতনায় আত্মহত্যা করেছিল। গ্যেটে বলতে চাননি যে এই-ই একমাত্র পথ, তাঁর নিজের জীবনে তিনি উদার মুক্তবুদ্ধির কল্যাণে নিবৃত্তি ও প্রশান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্যেটের কালে ইউরোপের তরুণ মহলে 'হ্বের্টরের দুঃখ' স্নায়বিক অবসাদ ও নৈরাশ্যের বন্যা এনেছিল, আত্মহত্যার পথে অনেকে সমাধান খুঁজেছিল

জীবনের ব্যর্থতার। চাইল্ড হেরল্ডের প্রথম পর্বের যে বাইরণ রক্তাক্ত হৃদয় বহন করে নিয়ে চলেছে সারা ইউরোপে সে হের্বেটরেরই প্রতিচ্ছবি। হের্বেটর এবং ফাউস্টের প্রথম খণ্ড তরুণ গ্যেটের ঝড় ও ঝঞ্ঝাযুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সেদিনের তরুণ সম্প্রদায় সমাজের কৃত্রিম বিধিবিধানের ঊর্ধ্বে প্রকৃতির মধ্যে সহজ হৃদয় ধর্মের প্রেরণা সন্ধান করেছিল। সেই স্বাভাবিক প্রেরণাও কিন্তু আবার নতুন কৃত্রিমতার জন্ম দেয়। রুশোর স্বভাববাদ পরিণত হয় দুঃখবিলাসের ভাবালুতার নকল উচ্ছ্বাসে। তরুণ গ্যেটেও এই ভাবস্রোতে ভেসেছিলেন কিন্তু ফিরে এসে ছিলেন সুস্থ মননশীলতার পরিবেশে। 'গৎস', নাটকে গ্যেটের রোমান্টিক উচ্ছ্বাসের শ্রেষ্ঠ পরিচয় থাকলেও নায়কের চরিত্রসৃষ্টিতে সংযম ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। 'গৎস' 'পথিকের ঝড়ের গান' বিদ্রোহের সুরে মুখর—তবু সেই বিদ্রোহের মূল প্রেরণা ভাবোচ্ছ্বাস নয়, গভীর আদর্শনিষ্ঠা। ফাউস্টের প্রথম খণ্ড রোমান্টিক আবেগপ্রবণ বটে এবং এজন্য গ্যেটে নিজেই ফাউস্টের প্রথম খণ্ডকে আত্মকেন্দ্রিক বলেছেন। তবে ফাউস্টের জ্ঞানপিপাসা রোমান্টিক আবেগকে ছাড়িয়ে প্রশান্তির আকাশে উঠতে চেষ্টা করেছে। ফাউস্টের প্রথম খণ্ড গ্যেটের তরুণ বয়সের ফুল—কামনার তীব্রতা ও দুর্বার কল্পনায় এই ফাউস্ট রোমান্টিক ঐতিহ্যের মহৎ নিদর্শন। তেমনি ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ড গ্যেটে প্রতিভার রসভারাবনত ফল। অবিশ্বাস ও নিরাশা, প্রলোভন ও প্রবৃত্তির মায়াজাল ছিন্ন করে এই ফাউস্ট আলোকের সন্ধান পেয়েছে। আত্মশুদ্ধি ও চিত্তজয়ের মহিমায় ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ড দান্তের ডিভাইন কমেডির মহত্তর সংস্করণ। এই রূপকের অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় অবাস্তবতা আছে অনেকখানি হয়ত। কিন্তু গ্যেটে একথা বলতে চাননি যে, আত্মার নির্লিপ্ততাই শ্রেষ্ঠ। ফাউস্টের সার সত্য হল, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এড়িয়ে গেলে অধ্যাত্মজীবনও অপূর্ণ রয়ে যায়। যে সত্য ভিলহেলম মাইস্টারের সামনে গ্যেটে তুলে ধরেছিলেন, ফাউস্টেও তারই ইঙ্গিত—'Remember to live'—বাঁচবার কথা ভুলো না। গ্যেটের জীবনসাধনা এই

পরিপূর্ণভাবে বাঁচবার সাধনা। তাঁর দীর্ঘজীবনে, বচনে, কর্মে, প্রণয়-লীলায়, রাষ্ট্র শাসনে, বিজ্ঞান অনুশীলনে সৃষ্টির অজস্রতায় অসংখ্য ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে। হ্বাইমারের নিভৃত উদ্যানকুঞ্জে যে বিশ্ববোধ ও উদার জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে, ইউরোপ তাকে যতবার অস্বীকার করেছে ততবারই বিপন্ন হয়েছে।

১৩৫৬

রমঁ্যা রলাঁ

রুশো, ভলতেয়ার ও ভিক্তর হ্যুগোর দেশ ফ্রান্স; শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক পাদপীঠ, বিপ্লবের মঞ্চভূমি ও কমিউনের জ্বলন্ত স্মৃতিপট ফ্রান্স; সঙ্কল্প, সংঘর্ষ ও অমর ঐতিহ্যের জন্মভূমি এই ফ্রান্স।

রমঁ্যা রলাঁর জন্ম এই ফ্রান্সে, ১৮৬৬ সনে। ফরাসী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অভিমান, জাতীয় সঙ্কীর্ণতার প্রতি সহজাত বিতৃষ্ণা এসবেরই উত্তরাধিকারী হলেন রমঁ্যা রলাঁ। উনবিংশ শতকের উদার দর্শনের শিক্ষা দীক্ষা বাণিজ্য-যুগের লেনদেনী মনোভাবের প্রতি তাঁকে করল বীতশ্রদ্ধ। ফ্রান্সের আরও অনেক নবীন শিল্পী ও দার্শনিকের মতো তরুণ রলাঁও মনে করতেন যে জীবনের চেয়েও মহৎ হল শিল্প। সেই প্রথম পণ্যসভ্যতাবিমুখ শিল্পী-গোষ্ঠী শিল্পের শুচি-রম্য কনকসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করলেন কল্পনার গজদন্ত মিনারে, ঘোষণা করলেন শিল্পের সমাজ ও বাস্তব নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের কথা। ভিক্তর হ্যুগো বলেছিলেন, আত্মসর্বস্ব জীবন যাপন করবার অধিকার কোন শিল্পীরই নেই। পরবর্তী কালে এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এহেন কথা খুব কম শিল্পীই বলতে পারতেন। আত্মমগ্ন সাধনাই ছিল অধিকাংশের লক্ষ্য, এবং তরুণ রলাঁও ছিলেন এদেরই অন্যতম। হ্যুগোর বিশ্বমানবতাবাদের প্রভাবে লালিত হওয়া সত্ত্বেও রলাঁ এই আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তবু অস্বীকার করতে পারেননি হ্যুগো ও ভলতেয়ারের সংগ্রামী মহত্বকে। জীবন বিমুখ কল্পনা-বিলাস ছেড়ে রলাঁ শেষ পর্যন্ত জীবন-প্রসারী মুক্ত-অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

রলাঁ যখন বালক তখন দোদেঁ, গঁকুর প্রভৃতি ফরাসী সাহিত্যের দিকপালেরা ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধ, শান্তি, জার্মাণ-অধিকৃত আলসেসলরেন সমস্যা, এক কথায় যা কিছু রাজনীতি-গন্ধী তা

সবই শিল্পীদের পক্ষে বর্জনীয়; নিছক শিল্প ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে শিল্পীদের আগ্রহ থাকা অনুচিত, শুধু অনুচিত নয়, অপরাধ! জীবনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পের এই গণ্ডীবদ্ধ ধারণা অবশ্য রলাঁকে খুব বেশিদিন আকৃষ্ট রাখতে পারেনি।

ভলতেয়ার ও হ্যুগোর কাছে বারংবার ফিরে এসেছেন রলাঁ। শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাঁকে দিশাহারা করেছে, কিন্তু এঁদের প্রভাব তাঁকে পথ দেখিয়েছে ও শক্তি জুগিয়েছে। রলাঁ এঁদের ঋণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। একদিন যে এঁদের উপহাস করেছিলেন তিনি, সেজন্য তাঁর মনে পরে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। তিনি বলেছেন—'লড়াইয়ের সময় ভিক্তর হ্যুগো ও ভলতেয়ারের দিকেই আবার আমরা ফিরে তাকালাম; এর আগে আমরা তাঁদের প্রতি সুবিচার করিনি, এবার তাঁরা আমাদের সংগ্রামের সাথী হয়ে সেই অবহেলার শোধ নিলেন। এখন আর শুধু ভলতেয়ারের বিদ্রূপকে নয়, তাঁর মানবিকতাকেও আমি মর্যাদা দিই, মর্যাদা দিই সেই স্বাধীনচেতার অমিত তেজকে যিনি বলেছিলেন,—'দুদিনের জন্য তো এই জীবন, এই সামান্য সময়টুকু আমরা যেন ঘৃণ্যতার পায়ে বিকিয়ে না দিই।'

হ্যুগো ও ভলতেয়ার—দুটি নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতেও যেন বাধে, এত বিপরীত এঁরা দুজন, এত পরস্পর বিরোধী। হ্যুগো যেন ফরাসী টলস্টয়—মানব প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত, ভাষার সম্পদ সম্ভারে, সৃজনী শক্তির অজস্রতায় মহীয়ান। আর ভলতেয়ার? যাঁর কণ্ঠে সিংহনিনাদের মতো ভয়ঙ্কর অট্টহাসি, যাঁর লেখনীতে ক্ষুরধার শ্লেষের চাবুক। যাঁর পর্বত প্রমাণ পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তিতর্কের আঘাতে শাসকেরা শঙ্কিত, পরাজিত, যাঁর ক্রোধোদ্দীপ্ত হাসির হুঙ্কারে সম্রাটের সিংহাসন ও পোপের ধর্মাসন টলায়মান, যাঁর ব্যঙ্গচ্ছটায় বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পান মিরাবো, মারা, দাঁতোঁ এবং রোবস্পিয়ের, সেই ভলতেয়ারের কাছে রলাঁ কিসের দীক্ষা চাইবেন? ভলতেয়ারের বিদ্রূপ বুদ্ধিজীবীদের ব্রহ্মাস্ত্র,

হৃদয়বান্ রলাঁর আবেগ-পীড়িত অন্তরাত্মা শ্লেষ-পরিহাসের খড়্গ দিয়ে কি করবে? রলাঁর ক্ষমা ও মমতা, ভলতেয়ারের ক্ষমাহীন নির্মমতা। রলাঁর হৃদয় সহানুভূতি নম্র। গভীর আন্তরিকতায় উদ্বুদ্ধ তিনি, তাই তাঁর ভাষা অশ্রুসজল ও গভীর। মহৎ মানবিক বেদনায় পরিমার্জিত তাঁর শিল্পীকণ্ঠ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রলাঁ যখন প্রতিবাদ করেন তখনও নিজে তিনি বেদনায় আপ্লুত, তাঁর হৃদয় তখনও রক্তাক্ত। কিন্তু ভলতেয়ার? করুণা নয়, বিজয়ীর দর্প ও ঘৃণাই তাঁর মূলমন্ত্র। রলাঁ এলেন অনেক পরে; তখন আকাশে ঝড় নেই, আছে ঝড়ের স্মৃতি—আর আছে ইউরোপের শত শত হৃদয়ে আশা ও আদর্শের জীর্ণ ভগ্নস্তূপ; স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর জটায়ু তখন ধূলায় লুণ্ঠিত, ভগ্নপক্ষ। ন্যায় ও যুক্তির উপর রলাঁর আস্থা ছিল ভলতেয়ারের মতোই দৃঢ়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিনিও ছিলেন অনুরূপ নিষ্কম্প। তিনিও বিদ্রোহী কিন্তু তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ অসীম করুণায় পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ, ধৌত।

রলাঁর হৃদয় ছিল বিরাট, কিন্তু সেই বিরাট হৃদয়ের আড়ালে তাঁর যুক্তি-নির্ভর মন একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিল না। অক্লান্ত সত্য সন্ধিৎসার ফলেই রলাঁর জীবন আলোক থেকে আলোকে, উজ্জীবণ থেকে উজ্জীবণে অগ্রসর হতে পেরেছিল। ভলতেয়ারের সঙ্গে তাঁর মিল এই অকুতোভয় যুক্তিবাদিতায়। যদি নিজেকে নিয়েই সুখী থাকতে চাইতেন তবে রলাঁ অনায়াসেই তা পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে পাণ্ডিত্যের সাধনায় আজীবন মগ্ন থাকতে পারতেন, ইচ্ছা করলে বেঠোফেন বা হাণ্ডেলের উৎকর্ষ-আলোচনাতেই জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। কখনো কখনো তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন, নীরব থেকেছেন, কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত হন নি। যুদ্ধের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়েও তাঁর শিল্পীমন একেবারে উদাসীন থাকেনি। মহৎ শিল্পী তিনি; কল্পনার দিগন্ত অনন্ত প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হতে পারেন না। জীবনের বহু বিচিত্র নিরন্তর ধারাকে বুঝতে না পারলে শিল্পী আর শিল্পী থাকেন না, শিল্পী হিসাবে তাঁর

ঘটে মৃত্যু। রলাঁ তাই আজীবন একনিষ্ঠ ভাবে জীবনকে বুঝবার সাধনাই করে গেছেন। যুদ্ধের উর্ধ্বে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন মাঝ পথে; এক হিসাবে, সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। কিন্তু তাই বলে তাঁর সেই বিরতির মুহূর্তেও তিনি ব্যবসায়ীর হাটে নিজেকে নামিয়ে আনেন নি। ফিলিস্টাইনদের মতো শিল্পকে অবসর বিনোদনের পণ্য করবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না।

ছাত্রজীবনে রলাঁর উপর টলস্টয়ের প্রভাব পড়েছিল। টলস্টয়ের শিল্প ও জীবনজিজ্ঞাসা রলাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ছাত্রজীবনে তিনিও নিজের মতো ক'রে জীবন ও শিল্পকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় অবশ্য তিনি ছিলেন টলস্টয়ের মতোই নিঃসঙ্গ, একক। ১৮৯০ সালে চব্বিশ বৎসরের ছাত্র রলাঁর সঙ্গে রোমনগরীতে মাল্‌ভিদা ফন্ মেইসেন্‌বের্গ নাম্নী এক বৃদ্ধা জার্মাণ মহিলার আলাপ হয়। এই মহিলাটি ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর তাঁর স্বদেশ থেকে নির্বাসিতা হয়ে ইতালীতে এসে বসবাস করছিলেন। নীৎশে, গারিবল্‌দি, ইবসেন এঁরা সকলেই ছিলেন এই মহিলাটির বন্ধু। ম্যাৎসিনি ও লুই ব্লাঁ ছিলেন তাঁর পরিচিত। মালভিদার কাছ থেকে তরুণ রলাঁ ইউরোপীয় উদারনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই জেনেছিলেন ও বুঝেছিলেন। রলাঁ সম্বন্ধে এই মহিলা তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন—'অন্যান্য জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আদর্শবাদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুদ্ধি ও ভাবধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এর আগেও আমি প্রত্যক্ষ করেছি; এই ফরাসী তরুণটির মধ্যেও আমি এই শ্রেষ্ঠ মনীষী সুলভ গুণ দেখতে পেয়েছিলাম।' এহেন সংবেদনশীল, হৃদয়বান তরুণের পক্ষে কোন সুলভ আপ্তবাক্যই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি খুব বেশি দিন সরে থাকতে পারেন না। তাই দেখি মানবতার জন্য সংগ্রামের ডাক যখন এল, তখন সাড়া দিতে তাঁর খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না।

অবশ্য এর জন্য রলাঁকে দীর্ঘ আত্মশুদ্ধি ও আত্ম প্রস্তুতির মধ্য

দিয়ে যেতে হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতর এবং সহানুভূতি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে; শিল্পকর্মে সৌখিনতার প্রলোভন তিনি অতিক্রম করেছেন; যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে এতকাল ধরে পীড়িত করেছে তাকে তিনি জয় করেছেন। শিল্পীর জ্ঞান, বিজ্ঞানও নয়, বোধিও নয়—এ জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে আবেগলব্ধ অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরে জীবনজিজ্ঞাসার রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে, হঠাৎ আলোর ঝলকানির আশায় তিনি উর্ধ্ব মুখে বসে থাকেন নি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই দুঃখের স্বরূপ চিনেছেন। ১৮৯০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত রলাঁ ছিলেন বিশ্ববাসীর কাছে প্রায় অপরিচিত। ফ্রান্সে তখন সঙ্কীর্ণমনা বুদ্ধিজীবীরাই সাহিত্যের সদর দরবার জমিয়ে রেখেছে—জীবনের প্রতি তাদের সকলেরই গভীর অনাস্থা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা আশাহীন, শ্রদ্ধাহীন। ১৮৭০ সালে জার্মাণীতে ফ্রান্সের পরাজয় এই হতাশাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করেছিল; বিশ বৎসর পরে রলাঁ যখন ফ্রান্সের বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন তখনও তাঁর সেই মহৎ প্রয়াস সফল হয় নি। জোলা ও মোপাসাঁ নাগরিক সভ্যতার বিকারকে নিঃসঙ্কোচেই জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন, এমন কি সর্বহারা শ্রেণীর উপন্যাস, বলতে গেলে, জোলাই প্রথম রচনা করেছিলেন। উত্তর ফ্রান্সের কয়লাখনির মজুরদের শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর 'জার্মিনালে' (অঙ্কুর) অনেক অসম্বদ্ধ কথা ও অপ্রাকৃত নাটকীয়তার সমাবেশ থাকলেও উপন্যাসের সর্বশেষ পংক্তি কটির মধ্যে আন্তরিক সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে আগামী দিনের সাধারণ মানুষেরই বিজয়বার্তা, 'বীজের মতো মানুষেরাও অঙ্কুরিত ও উদ্‌গত হচ্ছে, কালো কালো প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ দলে দলে জাগছে, ধীরে ধীরে উঠে আসছে লাঙ্গলের মুখ থেকে, আগামী শতাব্দীর ফসল তুলবে তারা; এই অঙ্কুরণের ফলে অচিরেই পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

তবে 'জার্মিনাল' ছিল তখনকার দিনের পথিপার্শ্বের অবজ্ঞাত চারাগাছ মাত্র, সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠির অন্তর্গত দীক্ষিত মুষ্টিমেয় ছাড়া

শতাব্দীশেষের বুদ্ধিজীবী কেউই তখন আগামী শতব্দীর ফসল নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

রলাঁকে প্রায় একাই পথ চলতে হয়েছিল, আর সে পথও ছিল দীর্ঘ ও বন্ধুর। অভিজ্ঞতার দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চল্‌লেন, নিঃসঙ্গ বলে ভয় পেলেন না, অবহেলা ও বিদ্রূপ তাঁকে বিচলিত করতে পারল না।

অতৃপ্ত রলাঁ বিশ বৎসর বয়সেই ভাগনের ও টলস্টয়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, ইতালী ও জার্মাণী থেকে মানবতাবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, মহত্তর প্রয়াসকে জীবনে রূপ দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছেন তিনি। চারিদিকে যখন মূঢ় পণ্ডিতম্মন্যতার জয়গান রলাঁ তখন খুঁজছেন বিপ্লবী ফ্রান্সের অমর অন্তরাত্মা মানবসভ্যতার মর্মবাণী আর গভীর আত্মজ্ঞান। তিনি দেখলেন নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা গভীরতা সবই জীবন থেকে অন্তর্হিত হতে চলেছে। সমসাময়িক নাটকের দৈন্য আর খবরের কাগজের ভণ্ডামি তাঁকে বিচলিত করে তুলল। ফরাসী বিপ্লবের পবিত্র শিখা আবার জ্বালিয়ে তুলবেন ফ্রান্সে এই আশা নিয়ে রলাঁ এগিয়ে এলেন। তাঁর রচিত ছটি নাটক দিয়ে শুরু করলেন ফ্রান্সে গণনাট্যের অভিযান। সমাজপতিদের কাছ থেকে এই নবনাট্য আন্দোলন কোন অভ্যর্থনাই পেল না, বরং তারা প্রথমে উদাসীন থেকে এবং পরে বাধা দিয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করল এই প্রচেষ্টাকে। রলাঁ নিরাশ হলেন।

এই আশাভঙ্গের আঘাত ছাড়াও আরও আঘাত এল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। বিবাহ বন্ধনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল অল্প দিনের মধ্যে। ক্লান্ত রলাঁ কিছুকালের জন্য হটে এলেন। পরবর্তী দশ বৎসর তিনি নীরব। একাকীত্বের মধ্যে আড়াল করে রাখলেন নিজেকে এবং এরই মধ্যে রচনা করলেন এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফ্। ক্রিস্তফে রলাঁ সেই আনন্দ আবিষ্কার করলেন যা শিল্পী-প্রতিভার প্রকাশ বেদনার ঝঙ্কার, সেই আনন্দ অধিকার করতে হয় দুঃখমূল্যের বিনিময়ে। তাঁর মানসপুত্র ক্রিস্তফকে

তাই রলাঁ উৎসর্গ করলেন সকল দেশের সকল জাতির মুক্তপ্রাণ মানুষদের উদ্দেশে যারা দুঃখবরণ ও সংগ্রাম করে এবং অবশেষে জয়ী হয়।

'জাঁ ক্রিস্তফ' হচ্ছে এক কল্পিত ব্যক্তি-জীবনের মহাকাব্য। এর সবটাই কাল্পনিক নয়। ক্রিস্তফের মধ্যে রলাঁ তাঁর নিজের অন্তরাত্মারই প্রতিবিম্ব দেখেছিলেন। উনচল্লিশ বৎসর বয়সে জাঁ ক্রিস্তফের ধারণা রলাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অনেক দিন ধরেই এই ভাবটি তাঁর মনে অঙ্কুরিত হচ্ছিল; যখন তিনি নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্র তখনই ভেবেছিলেন যে এমন একজন শিল্পীকে নিয়ে তিনি কথকতা সৃষ্টি করবেন যিনি সাধারণ জীবনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার অসামান্যতার শিখরে পৌঁছাবার জন্য বীরের মতো সংগ্রাম করছেন। রলাঁর জীবনে এক সৃজনশীল দুঃখবোধ চিরদিনই ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল। এই দুঃখবোধই একদিন অপরূপ সুরের আবেগ জাগিয়ে তুলেছিল বেঠোফেনের হৃদয়ে, গ্যেটের হৃদয়ে এবং অবশেষে রলাঁর হৃদয়েও। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহত বাণবিদ্ধ রলাঁ অন্তরের নির্জনতায় যে সৃজনী আবেগ অনুভব করলেন সেই আবেগ থেকেই জন্ম নিল ক্রিস্তফ; ক্রিস্তফকে তিনি পূর্ণ করে তুললেন তাঁর এই সময়ের জীবনের দূর দিগন্তে বিলীয়মান স্বপ্ন সাধ আদর্শ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে। শুধু রলাঁর আত্মবেদনাই নয় সমগ্র যুগের শিল্পী হৃদয়ের বেদনা বহন করে চলেছে ক্রিস্তফ। জাঁ ক্রিস্তফের পৌরাণিক কাহিনীটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ক্রিস্তফ ছিল এক মহা শক্তিমান পুরুষ। তীর্থযাত্রীদের নদী পার করবার ব্রত নিয়েছিল সে। একদিন বালকের বেশ ধারণ করে স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট তার কাছে উপস্থিত হলেন, পৌরাণিক কাহিনীর ক্রিস্তফ বালকবেশী যীশুকে কাঁধে করে নদী পার হতে লাগল। কিন্তু মাঝ নদী পর্যন্ত যেতে না যেতে তার মনে হল কাঁধের শিশুটি তার মতো শক্তিমানের পক্ষেও যেন অত্যন্ত গুরুভার। তখন যীশু খ্রীস্ট ক্রিস্তফকে বল্লেন, অবাক হোয়ো না, ক্রিস্তফ, তুমি শুধু

আমাকেই বহন করছ না, আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর যাবতীয় পাপের ভারও বহন ক'রে চলেছ। রলাঁ নিজেই বলেছেন, তাঁর ক্রিস্তফও হচ্ছে সেই পৌরাণিক ক্রিস্তফ যে শিশু পৃথিবীর ভার কাঁধে নিয়ে নদী পার হয়েছিল। উপন্যাস আরম্ভ করবার সময় রলাঁ একটি ব্যক্তি জীবনের কাহিনীই বলবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু যতোই তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন ততোই হাল্কা বোঝা ভারী হয়ে উঠতে লাগল, উপন্যাসের শিশুর সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর সমস্যা ভার এসে জুটল, ব্যক্তিগত জীবনীর পরিধি পেরিয়ে ক্রিস্তফ প্রসারিত হ'ল যুগ-জীবনের মহাকাব্যরূপে। রলাঁ ক্রিস্তফের জীবনকে তুলনা করেছেন নদীর সঙ্গে। নদীরপ্রবল স্রোত ধারার মতোই এ-জীবন নানা অভিজ্ঞতার বিচিত্র বাঁক ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে, বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে, অবশেষে ইউরোপীয় মানসের তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। রলাঁ উপন্যাসের শেষে বিভিন্ন দেশ জাতি ও মানুষের মধ্যে বিরোধ ও বিভিন্নতা সত্বেও এক ঐক্যের সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।. ক্রিস্তফ ও ক্রিস্তফের স্রষ্টা রলাঁর কাছে পৃথিবী হল বহু জাতির বহু ভাষার এক উদার ঐকতান। এই উপন্যাসে ফ্রান্স ও জার্মাণীর মধ্যে জাতিবৈরের সীমান্ত বিলুপ্ত। রলাঁ আশা করেছিলেন একবার যদি কোথাও কোন একটি জাতি-বৈর ও বিভেদের সীমান্ত লুপ্ত হয়ে যায়, তবে তার প্রভাবে কালক্রমে সব দেশের সব সীমান্তই লুপ্ত হতে বাধ্য।

জাঁ ক্রিস্তফ সমাপ্ত হ'ল ১৯১২তে। সারা য়ুরোপের বিদগ্ধ মহলে রলাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি পেল জাঁ ক্রিস্তফ থেকে। তবু ঐ উপন্যাস তাঁর মহৎ জীবনের শিক্ষানবীশ পর্বের স্বাক্ষর মাত্র। আরও বৃহত্তর বিজয় ও মহত্তর সম্মান তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। ১৯১৪ সাল। এল প্রথম মহাযুদ্ধ। যীশুখ্রীস্ট ও টলস্টয়ের শিষ্য রলাঁ জাতি-বিদ্বেষ ও যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে একাই নামলেন সংগ্রামে। ক্রিস্তফের মতোই তিনি একাকী, তাঁর প্রতিপক্ষ বহু। ক্রিস্তফের বন্ধু অলিভিয়ার যুদ্ধারম্ভের বহু পূর্বে বলেছিল, 'আমার শত্রুদের

প্রতিও আমি ন্যায়পরায়ণ হতে চাই। আমি চাই ঘৃণা ও বিদ্বেষের ঝড়ের মধ্যেও দৃষ্টির স্বচ্ছতা বজায় রাখতে; আমি চাই সব কিছু বুঝতে, সব কিছুকে ভালবাসতে।' প্রথম মহাযুদ্ধের ঝড়ের মধ্যে রলাঁ একদিনের জন্যও দৃষ্টির এই স্বচ্ছতা হারান নি; এজন্য কুৎসা ও নির্যাতন সবই তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন।

জাঁ ক্রিস্তফ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রলাঁর জীবনের শান্তিপূর্ণ শিল্প সমাহিতির অধ্যায় শেষ হ'ল। ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ারকে রাজনীতি ও সমাজনীতির হাটের মধ্য দিয়েই লড়াই ক'রে পথ ক'রে নিতে হয়েছিল। তারা আঘাত খেয়েছিল, আঘাত ফিরিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু রলাঁর মতোই তাদেরও ছিল একটি মাত্র বাসনা —কি করে এই ঘাত প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বভূমি থেকে বেরিয়ে আসা যায়, ফিরে যাওয়া যায় স্বধর্মে, আপন রাজ্যে শিল্পের স্বর্ণময় পরিবেশে।

১৯১২ সাল পর্যন্ত রলাঁ ক্ষুদ্র বন্ধু গোষ্ঠীর বাইরে ছিলেন নিতান্তই অপরিচিত, ১৯১৪ সালে যখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ তখন তিনি হয়ে উঠলেন মানব সভ্যতার প্রতিভূ ও নেতা, পৃথিবীর বিবেক। যুদ্ধ যখন এল তখন ক্রিস্তফের আত্মা যেন এসে ভর করল রলাঁর উপর। রলাঁ তাঁর একাকীত্বের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলেন, পাঁচ বৎসর ধরে সমানে বিভিন্ন যুধ্যমান দেশের লেখক, শিল্পী ও চিন্তাশীলদের প্রতি মানবতার ডাক পাঠালেন, ঘৃণা ও উত্তেজনার সুরে সুর মিলাতে নিষেধ করলেন তাঁদের; জাতীয় বৈরিতার মধ্য দিয়ে জাতিতে জাতিতে যে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল তা থেকে মনুষ্যসমাজকে মুক্ত করবার সংগ্রামে ব্রতী হলেন রলাঁ। মানব সভ্যতার যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য জাতি দেশ নির্বিশেষে সর্বত্র বর্তমান তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল তাঁর কাজ। তিনি ঘোষণা করলেন, কোনো জাতি বা দেশকেই শুধু তার সীমান্ত রক্ষা করলেই চলবে না, তার শুভ বুদ্ধিকেও রক্ষা করতে হবে। জাতি তার স্বাধীনতা রক্ষা করবে, আর শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা রক্ষা করবেন চিন্তার স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা।

শিল্পী যদি তাঁর উন্নতশির সর্বদা মেঘলোকের মধ্যেই তুলে রাখেন, তিনি যদি মনে করেন যে আত্মার মুক্তির সঙ্গে অগণিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মুক্তির কোনই সম্পর্ক নেই, তাহলে তাঁর শিল্প বেশিদিন প্রাণবন্ত থাকে না। চিন্তা ও কর্মের, শিল্প ও জীবনের মধ্যে এই কাল্পত ভেদ রলাঁ বর্জন করেছিলেন যখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। শান্তিবাদী রলাঁ 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' থেকে বাইবেলের 'অন্যায়কে সহ্য কর' নীতিরই ধ্বজা তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্বে 'আমি থামবো না'র লেখক অন্যায়কে বাধা দিতে ও পরাস্ত করতে কৃত-সঙ্কল্প। 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' থেকে 'আমি থামবো না' যেন এক যুগ থেকে আরেক যুগে উত্তরণ। এই দুয়ের মাঝখানে ইউরোপের হতাশার যুগ। যুদ্ধশেষের ক্লান্তি ইউরোপের যুবশচিত্তকে বিষাদে আচ্ছন্ন করেছিল; যুদ্ধের ফলে পুরানো আদর্শবাদের ফাঁকি তখন সুস্পষ্ট, যুদ্ধক্লান্ত যুবকদের সামনে কোনো জাগ্রত প্রেরণা নেই, আদর্শ নেই: খুব কম বুদ্ধিজীবীই তখন দূর দিক্ চক্রবালে নতুন সভ্যতার স্বর্ণ ঊষার 'আশ্বাস দেখে' নতুন সংকল্পের প্রেরণা পাচ্ছে। শিল্পের ক্ষেত্রে খেয়াল খুসীমত চমকপ্রদ রীতি প্রবর্তনেব দিকেই প্রবল ঝোঁক; অন্তঃসার শূন্যতাকে গোপন করবার, ভুলে থাকবার এই তখন সহজ পথ। প্রবীণ রলাঁ তখন সুস্থতর তরুণতায় উজ্জীবিত হয়েছেন। প্রুস্ত বা জয়েসের মতো মনোবিশ্লেষণের টুকিটাকিতে তিনি মন দেন নি, বাঁদার মতো শিল্পীর চুড়ান্ত ব্যক্তিত্ববাদের স্বেচ্ছাচারিতারও চর্চা করেন নি। বুদ্ধিসর্বস্বতারূপ ব্যাধির সামাজিক কারণ তিনি সন্ধান করলেন। জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই শ্রেষ্ঠ শিল্পের গূঢ় রহস্য। এই রহস্য মিল্টন জানতেন, ভলতেয়ার এবং হ্যুগোও জানতেন, এমন কি অহংবাদী বাইরণও প্রায় অজ্ঞাতসারেই এই সত্য অনুভব করেছিলেন। মিল্টন বলেছিলেন যে শ্রেষ্ঠ কবির জীবন হবে শ্রেষ্ঠ কাব্যেরই মতো; মিল্টন নিজেও জীবনে এই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। এই মহৎ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বেঠোফেন, গ্যেটে মিকাইলেঞ্জেলো সকলের মধ্যেই ছিল। রলাঁও এই আদর্শই তুলে

ধরলেন শিল্পীদের সামনে—কাব্যের জীবন ও জীবনের কাব্য এক হোক, এদের মধ্যেকার কৃত্রিম ব্যবধান দূর হোক।

রলাঁর জীবনচক্র নতুন ভাবে আবর্তিত হল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রাম থামল, শুরু হল শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংগ্রাম। সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতি রলাঁর মমত্ব এবং মোহ দূরীভূত হল। গণনাট্য রচনার কাজে যখন প্রথম হাত দিয়েছিলেন রলাঁ। (১৮৯৮-১৯০২) তখনও একবার এর খুব কাছাকাছি তিনি এসেছিলেন, টলস্টয়ের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন যে শিল্প-সৃষ্টির মূল্যায়ণ জীবন সম্পর্ক দিয়ে।

জাঁ ক্রিস্তফে রল্যাঁর জীবনের এক পর্ব সমাপ্ত, 'বিমুগ্ধ আত্মায়' সূচিত হল পর্বান্তর। ক্রিস্তফ ছিলো যুদ্ধের উর্ধ্বে, 'বিমুগ্ধ আত্মার' নায়িকা ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধের ভিতর। ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ছ' খণ্ডে সমাপ্ত রলাঁর এই নূতন উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যমণি নায়িকা আনেৎ, সে হচ্ছে জীবন স্রোতের প্রতিমূর্তি, মৃত্যুতেও তার মরণ নেই ; সে যেন এগিয়ে চলার মূর্ত প্রতীক। উপন্যাসের প্রথম তিন খণ্ডে দেখি, ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর নানা চটুল বিভ্রম ও প্রলোভনের মধ্য দিয়ে নায়িকা পথ হাতড়ে চলেছে। রাজনীতি বিষয়ে আনেতের বিশেষ আগ্রহ ছিল না,কিন্তু তার হৃদয়ে ছিল অমিত প্রেম। এই প্রেমই তাকে পথ দেখাল,অন্ধ লোকাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শেখাল প্রেমই তাকে সংগ্রামের কিনারে টেনে এনেছে। তার লোকাচার বিরোধী প্রেমের পরিণাম, পরম আদরের ধন একমাত্র পুত্র মার্ককে যখন ইতালীতে ফ্যাসিস্টরা হত্যা করল তখন আনেৎ তার নিজের হৃদয়কেও জ্বালিয়ে তুলতে পেরেছিল, তার হৃদয়ে প্রেম ছিল—যে প্রেম ছড়িয়ে পড়ল একলা মানুষ থেকে বহু জন হিতে। প্রশ্ন উঠেছিল, ন্যায় নীতি ও সমাজ বিধান সম্বন্ধে। এইসব প্রশ্নের উত্তর মার্ক জানত না, আনেৎও না, এমনকি তাদের স্রষ্টা রলাঁও নয়। উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে রলাঁ এই সব প্রশ্নের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলেন। সোবিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা তখন সবে

শুরু, বুদ্ধিজীবী চিত্তের সংশয় তখনও একেবারে ঘোচেনি। আনেৎ বা মার্ক স্পষ্ট করে জানতে পারেনি কখন এবং কোথা থেকে খড়্গ উদ্যত হবে, কে বা কারা শত্রু, কোথায়ই বা তারা, এবং কি করেই বা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত হতে হবে। অনুভব দিয়ে রলাঁ বুঝেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন আরো সুষ্ঠু উপলব্ধি। রলাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যায় যে ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ছিল তাঁর 'অনিশ্চয়তা এবং অধীর জিজ্ঞাসার' যুগ। 'বিমুগ্ধ আত্মার' শেষ খতে এসে আনেৎ এই অনিশ্চয়তার ছায়া পার হয়েছে, পার হয়েছেন রলাঁও; পথের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়েই ঝাঁপ দিয়েছেন জীবন তরঙ্গে। 'বিমুগ্ধ-আত্মায়' আনেৎ জীর্ণ অতীতের সীমান্ত পার হয়ে নবীন সূর্যোদয়ের পূর্বদেশে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর পদধ্বনি এগিয়ে আসছে বৃদ্ধা সন্তান হারা জননা আনেতের দিকে; কিন্তু তার চিত্তে কোনো দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, এখন আর সে একা নয়, সে সকলের সঙ্গে একাত্ম। সে জীবনের মহামুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে অবশেষে, এতেই সে সুখী, পরম সুখী। এই সুখই জীবনের চরম পুরস্কার, চরম প্রাপ্তি। বাকিটা খুবই সহজ, জীবনের স্রোতই তাকে লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবে; সে যে গতির সঙ্গে, স্রোতের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেছে এতেই তার মুক্তি। মৃত্যুতেও এই স্রোত রুদ্ধ হবে না, মৃত্যুর মুহূর্তেও সে রয়ে যাবে অগ্রণী, নেত্রী, নায়িকা।

ষাট বৎসর বয়সে এসে রলাঁও জীবনের পরিপূর্ণ পথ খুঁজে পেলেন। তিনি যে পথ খুঁজে পেলেন তার শেষ নেই; সে হচ্ছে জীবনে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হবার অনন্ত আশ্বাস, সমাপ্তি হীন সংকল্পের রেখা-চিহ্নিত তাঁর ক্রিস্তফ, কোলা-ব্রুনোঁ, ক্লেরেঁবোল্ এবং আনেৎ সকলেই বেরিয়েছিল জীবনের পূর্ণতর সঙ্গতি খুঁজতে, তারা কেউ নিজেদের সাধনাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায়নি। রলাঁও চান নি। যে নূতন আশ্বাস নিয়ে সমাজতন্ত্রের জন্ম হতে দেখলেন তিনি, তাতে ভাবীকালে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরিপূর্ণ মিলনের সেতু বন্ধন রচিত হবে এবিষয়ে প্রায় নিঃসংশয় হয়েছিলেন রলাঁ, সার্থক তাঁর দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা।

১৩৫১

আঁদ্রে জিদ

আনাতোল ফ্রাঁস ও রমঁ্যা রলাঁর পাশে আঁদ্রে জিদ? সুইডিস সাহিত্য পরিষদ আঁদ্রে জিদের হাতে তুলে দিলেন নোবেল প্রাইজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ-বাদী সাহিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কি করে সম্ভব হল? অথবা ১৯৪৭ সনের ইউরোপে বুঝি সবই সম্ভব।

যুদ্ধান্তের ইউরোপে আজ মৃত্যুর ছায়া, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, অর্ধেক ইউরোপে সুস্থতাবোধ নেই, না জীবনে, না কল্পনায়। তাই জীবন-বিমুখতার আদর্শের অস্তগামী মহিমা আঁদ্রে জিদের প্রতিভাকে প্রতিভূস্বরূপ গ্রহণ করল। জিদ বেঁচে রয়েছেন সাতাত্তর বছর বয়সে, পঞ্চাশ বছরের মৃত্যুমুখী শিল্পসাধনার স্মৃতিকে সম্বল করে। সত্যি কি বেঁচে আছেন আঁদ্রে জিদ? কে মনে রাখে জিদকে তাঁর নিজেরই দেশে? কোন্ মহৎ আদর্শের প্রেরণা জিদ দিতে পেরেছেন তাঁর স্বদেশবাসীকে, যখন নাৎসী বুটের তলায় ফ্রান্সের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গৌরব আর গর্ব গুঁড়িয়ে পড়ছিল? বিপ্লবের ঐতিহ্য গৌরবে ফ্রান্স হ'ল দুনিয়ার সেরা দেশ। সেই গৌরবকে ম্লান হতে দেয়নি ফ্রান্সের অগণিত দেশভক্ত শিল্পী ও যোদ্ধা জনসাধারণ, নিদারুণ দুঃখের রাত্রিতেও। জিদ শুধু পিছু হটেননি, পথও হারিয়েছেন। ফ্রান্সের চরম দুর্দিনে যাঁরা প্রাণ দিয়ে নতুন কালের প্রাণময় ইতিহাস রচনা করছিলেন, জিদ তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, দুর্ধর্ষ শত্রুর কাছে মাথা নোয়ানোই সুবুদ্ধির কাজ, কি হবে প্রতিবাদে, প্রতিরোধ? সত্তর বছর বয়সে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, দেখেছি তাঁর শিল্পীর মহৎ দায়িত্ববোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ, আবার জিদকেও দেখেছি সত্তরের কোঠায় তাঁর সারাজীবনের অহংসর্বস্ব শিল্পদর্শের জের টেনে এসেছেন নিজের জীবনে, জাতির জীবনে চরম সঙ্কট মুহূর্তে। জিদের

সর্বশেষ লেখা ডায়েরীর পাতার (১৯৪০-৪৪) ছত্রে ছত্রে তাঁর জীবন-বিরাগী শিল্প-সাধনার স্বাক্ষর। নাৎসী শাসকের অধীনে টিউনিসে বসে ডায়েরীর পাতার পর পাতা জিদ ভরিয়ে তুলেছেন আত্মসর্বস্বতার সান্ত্বনা দিয়ে। আবার ফ্রান্স যখন তার স্বাধীন সত্তা ফিরিয়ে পাচ্ছে চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, তখনও জিদের স্বপ্নস্বর্গে কোনা সাড়া নেই,উচ্ছ্বাস নেই।

বিস্ময়কর বৈকি যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভলতেয়ার, হ্যুগোর উত্তরাধিকারী আঁদ্রে জিদ। ভলতেয়ার পারেননি শত্রুর কাছে মাথা নোয়াতে।

তবু আঁদ্রে জিদকে বোঝা কঠিন নয়। জয়পরাজয়, জাতির জীবনে ভালোমন্দের উত্থানপতন, স্বাধীনতা, পরবশতা—এসবই জিদের কাছে আজ নয়, চিরদিনই বাহ্য ব্যাপার। নাৎসী শাসনকে মেনে নেওয়া তাঁর ভীরুতা বা সাময়িক দুর্বলতা মনে করলে জিদের বিস্ময়কর প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁর পঞ্চাশ বছরের শিল্পসাধনা যে ধারায় বয়ে চলেছে একটানা, তার স্বাভাবিক পরিণতি পরাজয়ে, সংশয়ে, নৈরাশ্যে, জীবন-বিমুখতায়। জিদ এবং জুলিয়া বাঁদার সেই একই ব্যক্তিবাদী আদর্শ। জগতের ভালোমন্দ ব্যাপারে সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও আর শিল্পীর থাক সুদূর বিস্তৃত কল্পনার মায়াপুরী যেখানে 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।' তবু কিন্তু মনে করা ভুল হবে যে জিদের শিল্পদর্শন নিবৃত্তিমার্গের। বৈরাগ্য নয়, ভক্তিও নয়, আর কর্ম ত জিদের কাছে 'বিশুদ্ধ' আত্মার দাসত্বের সামিল। জিদের চিত্তলোকে সত্যের যে রূপ ফুটে উঠেছে তাতে না আছে কোনো ভাগবত শক্তিতে বিশ্বাস, না জীবনের স্বীকৃতি। এ মায়াবাদ নয়, শ্রীকৃষ্ণে সর্বসমর্পণও নয়। চিত্তবিকারই জিদের জীবনবেদ। এ হ'ল ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বিকৃত বিষ-পুষ্প যার বর্ণে গন্ধে নেশা আসে, আর শেষ পর্যন্ত আসে অবসাদ, জগৎ ও জন-জীবনের প্রতি ধিক্কার।

ফ্রান্স কখনো জিদের ভ্রান্তিবিলাসকে পুরোপুরি মেনে নেয়

নি। আজ চলেছে বটে সারত্রের এবং আরো অনেকের লেখায় জিদের মত পীড়িত আত্মার পাপ-গর্বের পুনরুক্তি ও পুনরুল্লেখ, তবু ওরি পাশে এক অভিনব রেনেসাঁসের হাওয়া ফ্রান্সে পিকাসো-মাতিসের শিল্পকলায়, এলুয়ার আরার্গ'র কাব্য সাধনায়, মোরেই তুমায়েল, জোলিও-কুরি আঙ্গেরি'র সহযোগিতায়। সে হাওয়া জিদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত মায়াপুরীতে প্রবেশ করতে পারে না ঠিকই। পারে না বলেই হযত জিদের বিগতকালের সাহিত্যিক মহিমা এতদিনে স্বীকার করবার তাগিদ এল, যেমন তাগিদ এল যুদ্ধান্তের রাজনীতির আসরে সাবেকী কালের বিধান ফিরিয়ে আনার। বিশ্ব রাজনীতির ট্রুম্যান-বিধান কি বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শবাদেরও বিধান হবে? হয়ত তাই। তবু জিদের প্রতিভাকে বুঝবার পক্ষে এইটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট নয়।

কারণ, কথাশিল্পী হিসাবে অসাধারণ জিদের খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই-ই। মহৎ শিল্প এবং উৎকৃষ্ট শিল্প—এ দুইয়েব মধ্যে দুস্তর ব্যবধান মেনে নিলেও জিদ যে উৎকৃষ্ট শিল্পী একথা অস্বীকার করা যায় না। য়্যাণ্ড্রিয়া ডেল সর্টোর মত জিদের শিল্প-নিপুণতা অসাধারণ, নাই বা হ'ল কোনো মহৎ বেদনা অথবা বাণীর বাহক। জিদের কথাশিল্পে কথার যাদুকরী আছে শিল্পের অভিনবত্বও আছে; কিন্তু কথ্য আখ্যান কিছু আছে কি? 'আঁদ্রে ওয়াল্টারের ডায়েরী' (Diary of Andre Walter 1891) থেকে 'মেকি মানুষ' (The Counterfeiters 1925) পর্যন্ত জিদ লিখেছেন কমপক্ষে ত্রিশ খানি গ্রন্থ। কোনো দিনই তিনি পাঠকগোষ্ঠীর জয়ধ্বনির প্রত্যাশা করেন নি। জিদের ভাগ্য ভালো ছিল প্রথম থেকেই। লেখাকে তিনি আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন-সেতু হিসাবে দেখেন নি কখনো। তাঁর লেখা, তাঁরই লেখা, কেবল তাঁরই জন্য। জিদ যে জীবনদর্শন সৃষ্টি করেছেন তাতে ব্যক্তিসত্তা হল স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেই ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় শিল্পের সৃষ্টি আর সে সৃষ্টি এমনি অনন্যসাধারণ যে তার থেকে অন্য কারো কিছু পাবার প্রত্যাশা বৃথা। জিদ বলেন মনের কথা মনে

মনে। জিদ তাই অনুবর্তীদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'আমার বই সরিয়ে ফেলে দাও। মনে কোরো না তোমার সত্যকে তুমি পাবে অন্যের মারফতে।' জিদের রহস্যবাদী ব্যক্তিতান্ত্রিকতায় এক একটি মানুষ যেন লবণাক্ত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এক একটি দ্বীপের মতো। এখানে মানুষে মানুষে গভীরতম সত্তার যোগাযোগ অসম্ভব, অথবা হয়ত সম্ভব কেবল অস্পষ্ট চেতনার রহস্যময় প্রতীকের মধ্যস্থতায়। জিদ যা লিখেছেন সবই তাঁর নিজের নিগূঢ় সত্তার প্রেরণায়; লোককে জানাবার, বোঝাবার দায়িত্ব জিদের নয়। তাই বলা কঠিন জিদের ত্রিশখানিরও বেশী গ্রন্থের কোনখানি উপন্যাস এবং কোনখানি আত্ম-জীবনী, স্বগতোক্তি অথবা আত্ম-চেতনার অস্ফুট বিলাপ। জিদের নিজের মতে 'মেকি মানুষই'ই তাঁর একমাত্র উপন্যাস এবং শেষ গ্রন্থ। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। অন্ততঃ ইম্‌মরালিষ্টে (Immoralist, 1920) কথাবস্তু আছে, ঘটনা-বিন্যাসের চেষ্টা আছে, তবে জিদের নিজস্ব ভঙ্গীতে। সেই ভঙ্গীর জন্মবৃত্তান্ত আমাদের অজানা নেই। জিদের কথা শিল্পের বিশৃঙ্খল কলা-রীতি অকস্মাৎ দেখা দেয়নি। দুই শতাব্দীব শিল্প-কলার বিবতন রীতি বিশ্লেষণ করে আনাতোল ফ্রাঁস লিখেছিলেন, ১৮ শতকের আর্ট ছিল যুক্তিবাদী, ১৯ শতকের প্রথমভাগে আর্টে এল হৃদয়াবেগের ঢেউ (বায়রণ, সাতোব্রিয়াঁ)। তারপর স্বভাববাদীদের শিল্প-জগতে যুক্তির স্থান রইল না, হৃদয়াবেগও সঙ্কুচিত হল, রইল শুধু সহজাত প্রবৃত্তি। বের্গসঁর বুদ্ধিবিরোধী চেতনা-প্রবাহের দার্শনিক রূপকথা আনল নতুন সমর্থন—আর্টে বিশৃঙ্খলার, বন্ধনহীন প্রবৃত্তি নিয়ে মাতামাতির।

জিদ যে শিল্প-সাধনার ধারক তার প্রচণ্ড অভিমান বুদ্ধির বিরুদ্ধে, নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে। কথাশিল্পের আঙ্গিকে এই অভি-মানের অভিযান হ'ল ঘটনা ও চরিত্র-বিন্যাসের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করার। এই হ'ল শিল্পী-সত্তার সহজ হবার সাধনা। আর জিদের মতে যা সহজ, যা স্বাভাবিক তার কোনো নিয়ম নেই।

সমস্তই বিশৃঙ্খলা, অসংলগ্নতা,—শূন্যতা, তুচ্ছতা—কি আধার (form), কি আধেয়ের (content)। এই প্রবৃত্তি-প্রবণ মনস্তাত্বিক শিল্প-পরীক্ষার সুরু দেখেছি হেনরী জেমসে, অস্কার ওয়াইল্ডে অল্প-বিস্তর; ফ্রান্সে পেয়েছি বুর্জে, গুরমঁ এবং মরাসের মনো-বিকলনের মধ্যে জিদের 'বিশুদ্ধ' শিল্পের আভাস। জিদ যে ধারা পাকাপাকিভাবে প্রবর্তন করেন, তার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রুস্তে, জয়েসে, ভার্জিনিয়া উলফে। জিদ এবং তাঁর অনুগামীদের হাতে কথাশিল্পে আর কথকতার স্থান রইল না, রইল না ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাত। রইল শুধু চেতনার নিরবচ্ছিন্ন স্রোত আর মাঝে মাঝে ছোটখাটো অসংলগ্ন ঘটনার চড়া ও চোরবালি। সাবেকী উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ছিল চরিত্রের অবিস্মরণীয়তা। পিকউইক, মাদাম বোভারি, দেবদাস বা ক্যারেনিনাকে আমরা ভুলতে পারিনা। কিন্তু জিদের চরিত্র সৃষ্টি? 'মেকি মানুষে' এডুয়ার্দের জবানীতে জিদ উত্তর দেবেন, চরিত্র আবার কি? গাছের ঝাড়ের মধ্যে যখন বাতাস বয়ে যায়, স্বন স্বন ধ্বনি ওঠে,তখন অর্থপূর্ণ হ'ল ঐ ধ্বনিটি,শরগাছের ঝাড় নয়। মানুষ ত ঐ রকম শর-গাছ, তাকে নিয়ে শিল্পের কি প্রয়োজন? যে ধ্বনি মানুষের চেতনার গভীরে বেজে ওঠে তাকে ধরতে পারাতেই আর্টের সার্থকতা। তাই জিদের কথালোকে সবই স্বগতোক্তি, মুহূর্তের মাদকতা ও ভ্রান্তিবিলাস আর অচেতন মানসের উদ্দেশহীন স্রোতধারা। ব্যক্তি সত্তার এই জটিল আবর্তে ভেসে যাওয়ায় অদ্ভুত একটা ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ আছে বটে, তবু কোথাও শক্ত মাটিতে পা ফেলবার উপায় নেই। বলার সাধ্য নেই, একে আমি চিনেছি, বুঝেছি। আঁদ্রে ওয়াল্টারই হোক আর বার্ণার্ড কি লরা হোক এদের অসম্বন্ধ বাসনা-সঙ্কুল জীবনকে চেনা মানুষের মত ফ্রেমে ধরা যায় না। জিদ অবশ্য তাই-ই চান। কি হবে বালজাকের মত তিল তিল করে বস্তু-পিণ্ড সঞ্চয় করে চরিত্র ও ঘটনার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি রচনা?

প্রথম জীবনে জিদ ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ডের অন্তরঙ্গ। ওয়াইল্ডের মতই জিদের দাবী, আর্ট কেন জীবনের অনুকরণ করবে? আবার সাহিত্যের দুর্নীতি-অনুশীলনেও জিদ সম্ভবতঃ অস্কার ওয়াইল্ডেরই অনুগামী। জিদের প্রথম রচনা 'আঁদ্রে ওয়াল্টারের ডায়েরী' পড়ে অনুরক্ত এডমণ্ড গস্ পর্যন্ত চমকে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, বিকৃত কামাচারের এত সযত্ন সুস্পষ্ট বর্ণনা কেন দিলেন জিদ? জিদের উত্তর হল, 'যা কিছু গোপন তাকেই সত্যের আলোতে তুলে ধরা দরকার।' তবু আশ্চর্যের বিষয়, জিদের সত্যনিষ্ঠা কখনো বস্তুনিষ্ঠা হতে পারলো না। তাঁর সত্য সন্ধান কেবল চিত্ত-লোকের অন্ধকার রাজ্যে। জিদের শিল্পকর্মে সুস্থ জীবনের স্থান সঙ্কীর্ণ। জিদ বল্‌ছেন, জীবনকে যদি দেখতে চাও, তার জন্যে রয়েছে ফোটোগ্রাফ, আছে গ্রামোফোন আর সিনেমা। আর্টের উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিসত্তার গভীর দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করা। জিদের উপন্যাস তাই উপন্যাসই নয়, ডায়েরী মাত্র। এখানে নিয়মশৃঙ্খলা বা নির্মাণের দায়িত্ব নেই, এখানে আর্টের কাজ সামঞ্জস্য বিধান নয়, ঘটনা ও চরিত্রকে অর্থপূর্ণ করে দেখানো নয়। 'মেকি মানুষে' শিল্পী এডুয়ার্দের জবানীতে জিদ বল্‌ছেন, আমার উপন্যাসের কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না; পরিকল্পনা থাকবে না, বালজাক জোলার মত জীবনের খণ্ডিত রূপ আমি নেব না। আমি চাই সব কিছু প্রকাশ করতে, আমার উপন্যাসে সব কিছু আমি ঢেলে দেব ('I want to pour into it everything')। নিজের আত্ম-জীবনীতেও (Si le Grain ne Meurt—If it Die) একই কথা। অথচ সব কিছু জিদ দিতে পারেন নি, তাঁর মত পরিশ্রান্ত আত্ম-কেন্দ্রিক শিল্পীর পক্ষে দেওয়া সাধ্যাতীত। 'ইম্‌মরালিষ্ট' কি 'মেকি মানুষে' যে সব বিকারগ্রস্ত, বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির মনোরাজ্যের মানচিত্র আঁকা হয়েছে তারা একটি মাত্র পাড়ার বাসিন্দা—সে হ'ল সৌভাগ্যমন্তদের পাড়া। জিদের কথাবস্তু হ'ল এদের আহার নিদ্রা মৈথুন, অন্ধ আবেগ, উল্লাস ও কর্মহীন ক্লৈব্য। হয়ত 'বিশুদ্ধ

উপন্যাসে'র আদর্শ এমনতর 'বিশুদ্ধ' অবসর এবং রাজকীয় আলস্যের জগতেই সম্ভব।

জিদের কল্পলোকে মাত্র একটি সত্যই স্বীকৃত হয়েছে। সে হচ্ছে ব্যক্তিস্বরূপের অনন্যসাধারণত্ব দাবী। জিদের ব্যক্তিবাদ সর্বগ্রাসী। জিদ বলতে চান, কোনো দুজন মানুষেরই প্রকৃতি যখন এক নয়, তখন প্রত্যেকের সহজাত প্রকৃতির দাবী মেনে চলাই হ'ল তার স্বধর্ম। ব্যক্তি শুধু স্বতন্ত্র নয়, সে একক, অনন্য। পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের কোন সামাজিক শাসন বা পাবিবারিক অনুজ্ঞাই মানা চলবে না। জিদ তাঁর আত্মজীবনীতে (Si le Grain ne meurt) বল্‌ছেন, ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই সমাজে নীতি-বিধানের কঠিন ব্যবস্থা দেখে সন্ত্রস্ত হবেন। প্রকৃতি তাই প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করছে এই আচার-ব্যবহার নীতি-বিধানের একানুবর্তিতার বিরুদ্ধে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ কখনো কোন সর্বজনীন নীতি বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। ('To surrender oneself to a common rule seemed to my eyes as treason'). এক একজনের জন্য এক এক নীতি; আবার সে নীতিও কিছু চিরস্থায়ী নয়—Morality নয় moralities হ'ল ব্যক্তিস্বরূপের অবাধ প্রকাশের সূত্রধার। নীতি যখন বহুবচনান্তক, তখন পাপ-পুণ্য, ভ্রষ্টাচার, সদাচার সবই গ্রাহ্য, সবই গ্রহণযোগ্য, যদি তা' ব্যক্তি-সত্তার গভীর অনুভূতি থেকে বিকশিত হয়। অস্কার ওয়াইল্ডের অন্তরঙ্গ জিদ ওয়াইল্ডের গুরু পেটারের ব্যক্তিবাদকে মেনে নিয়েছেন সহজেই। শুধু মুহূর্ত মাহাত্ম্য, শুধু হীরক দীপ্তিতে জ্বলে ওঠা—পেটারের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—এই হল জিদের ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা এবং মোক্ষ। অতএব বিকৃত যৌনচার, একনিষ্ঠ প্রেম বা ভোগলালসা সবই ব্যক্তিবাদী নীতিশাস্ত্রে মঞ্জুর। জিদের আত্মজীবনী Si Le Grain ne Meurtএ ইমানুয়েলের প্রতি কামগন্ধহীন প্রেম এবং আরো অনেকের প্রতি লালসা দুই-ই অন্তর্জীবনের মৌলিক সত্য বলে জিদ গ্রহণ করেছেন। ইম্‌মরালিষ্টে অনন্য বাধাবন্ধহীন ব্যক্তি-বিলাসের আরো নিষ্ঠুর বিকৃত ব্যবহার

চিত্রিত হয়েছে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত নায়ককে সেবাযত্নে আরোগ্য করে তুলেছে তার স্ত্রী। তারপর সুরু হয়েছে সত্যের পরীক্ষা—বাইরে থেকে চাপানো সামাজিক অনুজ্ঞার দাবী বড়। জিদের নায়ক এর সহজ মীমাংসা করে দিল। তার স্ত্রী যখন ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী, নায়ক তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চলল নোংরা আফ্রিকান পল্লীতে। এই হ'ল আত্মার মুক্তি; সমাজের কৃত্রিম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে সহজ হবার সাধনা। অন্ততঃ জিদের নায়ক তাই বলছেন।

এই সহজ সাধনার প্রেরণায় জিদের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র উদ্দেশ্যহীন, অবলম্বনহীন, স্বভাবের গভীর দ্বন্দ্বে দোলায়মান। স্বৈরাচার এখানে সার্থক, কারণ আত্মার বিশুদ্ধ প্রেরণাই ত অসংলগ্ন অসম্বদ্ধভাবে ফুটে ওঠে। এই আত্মার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে Vatican Swindleএ নরহত্যাও অনুষ্ঠিত হ'ল। সহজ হও—সহজ হও—জিদ বারে বারে বলেছেন। কে সহজ হবে? কে হতে পারে? যে সহজাত অনুভূতির প্রেরণায় চলে। সবচেয়ে সহজ তাই নাম-গোত্রহীন সত্যকামেরা—যাদের জন্ম হয়েছে সমাজের নীতি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। 'মেকি মানুষে' শিল্পী এডুয়ার্দ বল্‌ছেন, যারা জারজ তারাই স্বাভাবিক হবার অধিকারী ('The bastard has the right to be natural')। আর সব মেকি—সমাজবন্ধন, রীতি নীতি, সংগঠন সবই ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ বিকাশের বাধা। যারা স্বাভাবিক, যারা অকৃত্রিম, ভবিষ্যৎ তাদেরই হাতে। ('It is to bastards that the future belongs') জিদ এখানে আক্ষরিক অর্থে 'জারজ' বলতে চাইছেন না। 'জারজ' তারাই যারা কি জীবনক্ষেত্রে কি মানসক্ষেত্রে কারো শিষ্য নয়, কারো সন্তান নয়। মেকি মানুষ তারাই যারা আশ্রয় খোঁজে আশ্বাস চায়, পিতার, গুরুর অথবা নেতার। জিদের মতে আত্মার বীরোচিত প্রকাশ হ'ল সব কিছু অবিশ্বাস করায়, কোনো মতকেই স্বীকার না করায়। ('To be heroic is to be without dogma or faith')।

সমস্ত নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ হল জিদের প্রতিভার একমাত্র কম্পাস। সেজন্য বিস্ময়ের কিছু নেই যে, একদা জিদ সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ফিরে এসে বলশেভিক বিপ্লবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তখন ছিল সোভিয়েটের প্রথম অধ্যায়—পুরোনো নিয়ম কানুন ভাঙবার যুগ, জিদের তাকে ভালো লেগেছিল, সোভিয়েটের 'স্বাভাবিক' হবার চেষ্টা দেখে। এর পর ইতিহাস এগিয়ে গেল, সোভিয়েটে সুরু হ'ল নতুন সমাজ-গঠনের পরিকল্পনা। জিদ আবার দেখলেন আর আশ্চর্য হলেন, কোথায় তাঁর মনের মত রোমান্টিক খেয়াল খুশীর স্বর্গরাজ্য? আবার জিদ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, সহজ হও, হও; আত্মস্থ হও; অন্তরের নির্দেশ একমাত্র সত্য বলে মানো। তবুও জিদ ভরসা ছাড়েন নি, তিনি ভরসা রেখেছিলেন হয়ত একদিন সম্ভব হবে—ব্লেক যেমন কল্পনা করেছিলেন স্বর্গ ও নরকের বিবাহ—মিলন, তেমনি ব্যক্তিবাদ ও সাম্যবাদের সমন্বয়। জিদের বন্ধু প্রতিবাদ করেছিলেন, সে কি করে সম্ভব—এক জল, অন্যটি আগুন। জল ও আগুনের সমাহারেই বাষ্প তথা শক্তির জন্ম। জিদ আশা রেখেছিলেন, হয়ত একদিন এই শক্তিই জন্ম নেবে, আর সংশয়, বিকার আত্ম-নিগ্রহের পাপ-চক্র থেকে মুক্তি দেবে তাঁর প্রতিভাকে। সেদিন এখনো আসেনি। আপাততঃ জিদ সংশয়ী, একেবারে সঙ্গীহীন সংশয়ী। ফ্রান্সে তাঁর সগোত্রীয় সংখ্যায় নগণ্য।

দেকার্ত বলেছিলেন, সংশয় থেকেই সত্যের উপলব্ধি। জিদের সংশয় কিন্তু সত্য সন্ধানের সুস্থ প্রেরণা নয়। দেকার্ত ছিলেন নতুন বণিক যুগের পুরোধা, তাঁর সংশয়ের পিছনে ছিল বলিষ্ঠ বিশ্বাসের প্রেরণা—বিশ্বাস ছিল সংশয়ের শাণিত তরবারি দিয়ে সামন্ত যুগের অনেক অর্থহীন নিয়ম বন্ধন ছেঁটে ফেলা যাবে। জিদের সংশয় হ'ল যুগান্তের অন্ধকার; ভাবী সম্ভাবনার আলো পড়েনি জিদের চিত্তলোকে। যুগান্তের এই ঘনায়মান মৃত্যুছায়া জিদের আবিষ্কার নয়—বরঞ্চ বলতে হয়, অমন যে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিস্বরূপ, তার উপরেও বাইরের জগতের

দুর্গতির কালিমা জমেছে কালধর্মে। জিদের 'বিশুদ্ধ' আত্মা যত সন্তর্পণেই চলুক না কেন, যুগান্তের অন্ধকার সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে চিত্ত বিকারে, আত্মঘাতী নিরাশায় ও সমাজবিরোধী স্বৈরাচারে। জিদ না মানতে পারেন, তবু তাঁর প্রতিভা, তাঁর চিরবিদ্রোহী সংশয় সবই কালচিহ্নিত। জিদের পীড়িত আত্মচেতনা তাঁর একলার নয়, গত শতাব্দীর শেষ থেকে সভ্যতার যে সঙ্কট সুরু তাই-ই পরিশ্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের মনোরাজ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। জিদের সাহিত্য অনুশীলনের প্রথম যুগে ফরাসী সাহিত্যের ক্লান্তির লক্ষণ দেখে বুর্জে লিখেছিলেন, শিল্পী মানস আজ ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ আজ নিরর্থক, খণ্ডিত মনে হচ্ছে। প্রথম জীবনে এই মুহ্যমান নিরাশার প্রতিষেধক সন্ধান করেছিলেন জিদ ফিকে রহস্যবাদের মধ্যে। আঁদ্রে ওয়াল্টারের ডায়েরীতে তার চিহ্ন পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত রহস্যবাদের রোমাঞ্চেও জিদের পীড়িত আত্মাকে প্রাণবন্ত করতে পারেনি।

সংশয়ই হল জিদ প্রতিভার চূড়ান্ত সত্য। সংশয়েও জিদের শান্তি নেই। তিনি ভেবে পান নি, সন্দেহই কি যথার্থ অথবা যাকে সন্দেহ করছি,—যে ধারণাকে গ্রহণযোগ্য মনে করছি না তারও মধ্যে কি সত্য থাকতে পারে না? শেষ পর্যন্ত জিদের সংশয় হ'ল মহামারীর মত। সংশয়েরও সংশয় তাঁর শিল্পসত্তায় জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। জিদের ডায়ালেকটিকে দ্বন্দ্ব আছে সমন্বয় নেই। সেইজন্যই শিল্পী জিদের কোনো বাণীও নেই। কি বলতে পারেন তিনি তাঁর ভক্তদের? তাঁর আত্মজীবনীতে, গল্পে, বর্ণনায়, বিশ্লেষণে আছে শুধু অর্ধ-চেতন ও অতি সচেতন মানসের শুক-শারী কথন। এই কথালাপ কখনো তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত, গভীর, কখনো নানা বিচিত্র রূপকে উপমায় অর্থবহুল। তবু জিদের বক্তব্যের কোনো অর্থই পরমার্থ নয়; তার মূল্য শুধু মুহূর্তের জন্য—নিমেষের অনুভূতিকে উজ্জ্বল করেই তার আয়ু শেষ। এই হ'ল জিদের সংশয়ের ধর্ম। এক হিসেবে জিদের মতে এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতাই হ'ল স্বাভাবিক,

অতএব স্থায্য। তবু জিদ পরমুহূর্তেই সন্দেহ করেছেন, আত্মার স্বাধীনতা চাই বটে, কিন্তু কিসের জন্য? ব্যাভিচার? ব্যক্তি বিলাস? শেষ পর্যন্ত জিদও সংশয়ে পড়েছেন। মেকি মানুষের বার্ণার্ড বিদ্রোহ করেছিল পারিবারিক শাসনের বিরুদ্ধে, শেষ পর্যন্ত বার্ণার্ডকেও ভাবতে হ'ল, বিদ্রোহকেই বা চূড়ান্ত বলে মানি কেন? সে-ও ত একরকম নিয়মানুবর্তিতা। অতএব আবার নতুন সংশয়—বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অবশেষে পরিবারের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন। জিদের লেখার ছত্রে ছত্রে এই অস্বস্তিকর সংশয় ও অনিশ্চয়তা। কাকে বলি সত্য, কোথায় সত্যের সন্ধান—এই ধরণের প্রশ্নবাণে জিদের মেকি মানুষেরা চিন্তা জর্জর। সান্ত্বনা পেয়েছে ক্যাথলিক গির্জার জপতপ সাধন-ভজনে; আর জিদের অনুবর্তী অনেকে ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ বিকাশের পথ চিনে নিয়েছে বহু মানুষের মিলিত জীবনের যৌথ চেষ্টার মধ্যে।

জিদের সংশয় অচল, অনড়। তাঁর নিজেরই গড়া বার্ণার্ডের মত, অথবা হ্যামলেটের মত সংশয় তাঁর বিশ্বাসকে আঘাত করে, আবার বিশ্বাস সংশয়কে। কোথায় এর সমাধান? জিদ তা জানেন না, তিনি শুধু জানেন মনের গহনে সব একাকার বিশৃঙ্খল, তবু অসংখ্য অস্ফুট গুঞ্জনের মধ্যে যেটুকু ধরতে পারা যায়, সে হচ্ছে এই যে, আমি আছি; আমি থাকব আমার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। এই 'আমি' নিঃসঙ্গ। এর ভালো লাগা, মন্দ-লাগা, পাপ পুণ্যের বিচার, সত্য অসত্যের হিসাব-নিকাশ সব কিছু বাস্তব থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। জিদের চোখে বাস্তব হ'ল সত্যের বিরোধী। বাস্তবের রূপ বাঁধা-ধরা, সত্যের প্রকাশ সহস্ররূপে। অতএব জিদ বলছেন আত্মাকে সমস্ত বাস্তবতার ছোঁয়াচ থেকে সরিয়ে আনো, সহজ হও, একান্ত হও, আর গ্রীক দেবতারা যেমন মানুষের সুখ-দুঃখে নিরাসক্ত হয়ে, ওলিম্পাসের চূড়ায় পরম আলস্যে কালহরণ করতেন, তেমনি-ভাবে নিজের সত্তায় নিমজ্জিত হও। এহেন শিল্পীদের লক্ষ্য করে রলাঁ বলেছিলেন, 'যে অহঙ্কার নিজেকে চেনে, চেনে না নিজের

দীনতাকে সেই অহঙ্কার আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে।' তাই কি জিদ যখন স্বধর্ম রক্ষা করছেন জাগতিক জিজ্ঞাসা ও সমস্যা থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে দূরে রেখে তখন তাঁর কপালে এঁকে দেওয়া হল শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদের জয়টীকা ? হয়তো তাই-ই।

অনেকের মতে আঁদ্রে জিদ কোনদিনই কৈশোর যৌবনের সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, তাঁর উল্লাস, আবেগ ও কল্পনার স্থায়ী বৃত্ত কৈশোর-চেতনার—বয়ঃসন্ধিকালের দোষ এবং গুণ তাঁর মনন ও জীবনে জড়িয়ে আছে পরিণত বয়স পর্যন্ত। ফরাসী ভাষায় গীতাঞ্জলির 'অনুবাদকরূপে আঁদ্রে জিদের নাম অনেকের পরিচিত। তবে গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ম কল্পনা জিদকে আকৃষ্ট করেছিল কিনা, বলা কঠিন। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী, তাঁর কবি প্রতিভা স্ফুরণের বর্ণনা জিদের ভালো লাগেনি। তাঁর বিখ্যাত 'জর্ণালের" একস্থানে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি তাঁর পক্ষে ধৈর্য ধরেপড়া সম্ভব নয়, 'প্রাচ্যের মর্মকথা' তাঁকে আকর্ষণ করে না। অথচ জিদের নিজের শিল্পরীতির মৌলিক আবেগ যুক্তিবাদী নয়, বরঞ্চ রহস্যবাদী এবং কাব্যধর্মী বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি জিদের ক্লান্তিকর মনে হওয়াটা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় বৈকি। সম্ভবতঃ এর কারণ হল, অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের রস আস্বাদনের বাধা অনেক, ভুল বোঝার সম্ভাবনা পদে পদে। কাজেই জিদের প্রতিভাকে, তাঁর শিল্প-রীতিকে আমরা ভালোমত বুঝেছি ও তার সুবিচার করেছি, এরকম দাবী করতে যাওয়া দুঃসাহসিক হবে।

১৩৫৪

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

এবছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক। মরিয়াকের নাম অপরিচিত নয় আমাদের দেশে। আনাতোল ফ্রাঁস, বের্গসঁ, রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ যতটা ঘনিষ্ঠ, শ্রদ্ধায় অনুরাগে অভিষিক্ত, মরিয়াকের সঙ্গে পরিচয় ঠিক সে রকমের নয়। এর জন্য ত্রুটি আমাদের নয়, প্রত্যক্ষভাবে মরিয়াকেরও নয়। সমকালীন ফ্রান্স এবং ইউরোপেরও প্রথম শ্রেণীর কথা-শিল্পীদের অন্যতম তিনি। যুগের পার্থক্যে গুণেরও তারতম্য হয়, শিল্প-মূল্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে বিগত যুগের দ্বিতীয় শ্রেণী আজকের প্রথম শ্রেণী বলে গণ্য হতে পারে। আমাদের যুগ হ'ল 'গ্রেট মাইনরের' অর্থাৎ খণ্ড-প্রতিভার যুগ। সমসাময়িক প্রথম শ্রেণীর কোন্ কবি রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য গণ্য হবেন, অথবা কোন্ কথাশিল্পী গলসওয়ার্দি বা টমাস ম্যানের? আনাতোল ফ্রাঁস, ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ড শ, গল্সওয়ার্দি, হামসুন, বোয়ের এমন কি কিপ্‌লিং পর্যন্ত আমাদের পরিচিত হয়েছিলেন অনায়াসে, তাঁরা নোবেল পুরস্কারের পাঞ্জা পাওয়ার অনেক পূর্বে। বিগতকালে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছিলেন, তাঁদের ও সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে পার্থক্য এইখানে। এটি প্রতিভার মৌলিক পার্থক্যও বটে।

কেন এই মৌলিক পার্থক্য সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা দিয়েছে, তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। মরিয়াকের সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয় দিতে গেলে ২।১টি সাধারণ কারণ উল্লেখ করা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যে এবং শিল্পে আজকাল শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিরল অথবা শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সর্বজনীন স্বীকৃতি পাচ্ছে না, এটা অনেকেই বলছেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যে ফরমায়েস মত পাওয়া যায়

না, এ-ও আমাদের অজানা নয়। সাহিত্য-অনুশীলন ও প্রচেষ্টার বিরাম নেই। 'মহৎ সাহিত্যের অভাব যদি বা ঘটে থাকে, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে এখনও। অভাব ঘটেছে শিল্প-প্রতিভার সর্বজনীনতার। শিল্প-মানস আজ খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত, নানা সংশয় ও ভীতিতে শিল্পী হয় দিশাহীন, নয়ত উগ্রভাবে স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী বা গোষ্ঠীবদ্ধ। যেমন রাজনীতি তেমন সাহিত্যও আমাদের কালে এক প্রবল, সর্বগ্রাসী ভাবনৈতিক দ্বন্দ্বের আবর্তে ঘূর্ণমান। ইউরোপের সমসাময়িক সাহিত্য-প্রয়াস দেখে মনে হয়, এই সঙ্কটের চাপে সমাজ ও শিল্প-মানস খণ্ডিত হয়ে গেছে স্থায়ীভাবে। সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যে ত দুই বিরোধী শিবিরের সীমানা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। একদিকে ম্যালর্যা, মরিয়াক, জুল রোমঁ্যা, ক্যেমু, মঁতারলঁাত, অন্যদিকে আরাগঁ, এলুয়ার, গারোদি, আঁদ্রে স্তিল। ফ্রান্স হল ইউরোপীয় সংস্কৃতির বনিয়াদী পীঠস্থান। এই পীঠস্থানের দখল নিয়ে দুই বিরোধী শিবিরের বিতর্ক ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা চলেছে বিরামহীন; শ্রেষ্ঠ ফরাসী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার দাবীতে কিন্তু দুইপক্ষই সমান উৎসাহী। তীব্র আদর্শ সংঘাত সত্ত্বেও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা একটি মিলন-সূত্রও বটে, যার জন্য কম্যুনিষ্ট গারোদি গোঁড়া ক্যাথলিক' মরিয়াকের শিল্পোৎকর্ষকে অগ্রজের প্রাপ্য শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারেন না।

মরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি লেখা হয়েছিল বিশ ও ত্রিশ দশকে। এখন তিনি সাহিত্যিক হিসাবে নিঃশেষিতপ্রায়। ইউরোপীয় সংস্কৃতির এখন হল গোধূলির ম্লান বিষণ্ণতা; তার সাহিত্যেও প্রায় নিস্প্রদীপ অবস্থা সুরু হয়েছে। সাত্রের 'অহংবাদ' অনেক আশ্বাসহীন মনের শেষ আশ্রয় হয়েছে, সেটা আশ্চর্যের কথা নয়। ফ্রান্স এবং ইউরোপের উপরে নেমে এসেছে পরমাণবিক বিপর্যয়ের ভীতি ও বিষণ্ণতার ছায়া। সাহিত্যে দুঃখবাদ ও রোমান্টিক আত্ম-পরতা গত শতাব্দীতেও কম ছিল না। ছমুসে ও বোদ্‌লেয়র থেকে প্রুস্ত, ভালেরী এবং আঁদ্রে জিদ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্য যে বিশিষ্ট ধারা বহন

করে এনেছিল, তার মধ্যে অবশ্যই ছিল নানা স্থূল অথবা সূক্ষ্ম মনোবিকার ও আত্মবিলোপের প্রেরণা। তবে এখনকার সর্বগ্রাসী সংশয়, অবসন্নতা ও বিষাদের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। এই মহা-প্রলয়ের বিষণ্ণতাই বোধ হয় সবচেয়ে বিস্তৃত সর্বজনীন অনুভূতি বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পী-মানসে। এর ব্যতিক্রম আছে—সেই ব্যতিক্রমকে কম্পাসের মত চিহ্নসূচক ধরা যেতে পারে—সুমেরু ও কুমেরু—ক্যাথলিক মরিয়াক ও কম্যুনিষ্ট আরাগঁ: ফরাসী সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত দিলেও সারা ইউরোপের শিল্প-মানস ও প্রচেষ্টার এই পরিস্থিতি—ক্যাথলিক এবং কম্যুনিষ্ট—এই দুই প্রবল বিশ্বাসের বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। এই মধ্য শতাব্দীর ইউরোপীয় চিত্তের লক্ষণ ও অনুরক্তি বর্ণনা করিতে গিয়ে 'টাইমস লিটারেরী সাপ্লিমেণ্ট' লিখেছেন—'একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কোনও না কোন একটা স্থির বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করার একটা অসাধারণ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ক্রমেই অনেক লোক উদার চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মনের মত কোনও গোষ্ঠীর সন্ধান করছে। ফলে আপাত সুবিধা লাভ করছে গোঁড়া বিশ্বাসের দুটি বিরাট যন্ত্র—ক্যাথলিক মতবাদ ও কম্যুনিজম।'

ফ্রঁাসোয়া মরিয়াক ক্যাথলিক মতাবলম্বী। তিনি মনে করেন তাঁর ধর্মাদর্শ থেকে তিনি পেয়েছেন তাঁর সাহিত্য প্রয়াসের মূল প্রেরণা। গল্‌সওয়ার্দি খৃষ্টান ছিলেন কিনা, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম কি হিন্দু এমন ধরণের প্রশ্ন সাহিত্য-রস উপভোগে আমাদের কাছে একেবারেই অবান্তর ছিল। মতবাদের সংঘর্ষে এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের কুলশীল পরিচয় অর্থপূর্ণ হয়েছে। মরিয়াক ধর্মপ্রাণ হলেও ক্যাথলিক সমাজপতিদের সমর্থন পাননি অনেকদিন পর্যন্ত। ধর্মযাজকেরা মরিয়াকের উপন্যাস দুর্নীতিমূলক ঘোষণা করেছিলেন, আপত্তিকর তালিকাভুক্ত হয়েছিল মরিয়াকের অনেক লেখা। মরিয়াক তাঁর জীবন দর্শনের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন, বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ আত্মা

বাস্তবজগতে দেখা যায় না, দেখা যায় কেবল উপন্যাসে, আর যে উপন্যাসে এইরকম পুণ্যকথার ছড়াছড়ি, সে হল খারাপ উপন্যাস। আমরা যে চরিত্র মহান বলে অভিহিত করি, সে চরিত্র আসলে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিকশিত। এই দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে কথা-সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন হতে পারে না। পাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সাহিত্যিক সত্যনিষ্ঠ হতে পারেন না। এই হল মরিয়াকের বক্তব্য। ক্যাথলিক এবং বিশেষ করে ফরাসী সংস্কৃতির ধারাবাহী ক্যাথলিক হলে কোনও শিল্পী পাপের অস্তিত্ব এবং অনতিক্রমনীয় প্রভাবকে সাহিত্য থেকে বাদ দিতে পারেন না। ক্যাথলিক ধর্মেব গৌরব হল পাপের স্বীকৃতিতে, পাপকর্মের অনুশোচনায় ও আত্মনিগ্রহে। যে আদিম পাপ মানুষ বংশপরম্পরায় বহন করছে, তার হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার পথ হল ক্যাথলিক অনুশাসন। মরিয়াকের উপন্যাস তাই পাপ বর্ণনায়, মানুষের মনে ও জীবনে সুরাসুরের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে শ্লীলতা অশ্লীলতাব কোন আবরণ রাখেনি। মনোবিকার, আবেগ, কাম ও লোলুপতার বাস্তব রূপায়নে মরিয়াক ঠিক ক্যাথলিক নন, তিনি বালজাক-জোলা ঐতিহ্যের ধারাবাহী। মরিয়াক ধর্মাশ্রয়ী, নীতিবাদী। নীতিবাগীশ নন; কিন্তু ক্যাথলিক এবং ফরাসী জীবন রসিক ত বটে। পাপের মোহিনী মায়া ক্যাথলিকরা হয়ত ভাল বোঝে; আর পাপময় এই মর-জীবনের একমাত্র আশ্রয় যে ধর্ম সেকথা হাজার রকম ক্যাথলিক বিধি-নিষেধে, অনুশাসনে, স্বীকৃতিতে লেখা হয়। মননশীল ফরাসীর চরিত্রেও দেখা যায় কতকটা এই ধরণের দ্বৈত লীলা —একদিকে সহজাত, আবেগপ্রবণতা অন্যদিকে ধ্রুব সত্যে আশ্রয়-সন্ধান। মরিয়াকের সাহিত্যিক জীবনাদর্শ ক্যাথলিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হয়নি। শিল্পীর কর্তব্য হল জীবন-সত্যের প্রতিফলন ঃ ক্যাথলিকের কর্তব্য হল পাপের স্বীকৃতি ও অনুতাপ। মরিয়াক এই দুয়ের সমন্বয় করে বলেছেন, মানুষের চরিত্রের যে দিকটা অন্ধকার, মনের যে গহন অরণ্যে দিব্যশক্তির সঙ্গে পাপ কামনার

বিরোধ, সেই দিকটায় সন্ধানী আলো ফেলা হল সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মনিষ্ঠ শিল্পীর কর্তব্য। মরিয়াক লিখেছেন প্রচুর উপন্যাস—প্রায় ত্রিশখানি বোধ হয়। এ ছাড়া তিনি লিখেছেন রাসিন ও যীশুব জীবনী, কবিতা, নাটিকা এবং অসংখ্য প্রবন্ধ। এখনও মরিয়াক লিখছেন, সে হল প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে। প্যারির প্রসিদ্ধ দক্ষিণপন্থী দৈনিক 'ফিগারো'র অন্যতম কর্মকর্তা তিনি। প্রতি সপ্তাহে ২।৩টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও তেজস্বী লেখনীতে কম্যুনিজমের আদর্শ ও কর্মনীতির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। মূলতঃ সাহিত্যিক হলেও, রাজনীতিকে মবিয়াক এড়িয়ে যাননি—অন্ততঃ ত্রিশ দশক থেকে নানা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তিনি প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। আঁদ্রে জিদের মতো সহজ প্রবৃত্তির অনুশীলনকে স্বধর্ম বলে মরিয়াক গৌরব করতে পারেন নি। আবার গোঁড়া ক্যাথলিকদের মতো তিনি ফ্যাসিজমেব প্রতি প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুবক্ত হননি। ফ্রাঙ্কোর ক্যাথলিক ফ্যাসিজমের বিরোধিতা তিনি করেছিলেন ত্রিশ দশকে। ফ্রান্স যখন নাৎসী জার্মাণীর দখলে, তখন আঁদ্রে জিদের মতো স্বধর্মচর্চাব নিরাপদ আশ্রয় মরিয়াক নেন নি। তিনি ফ্রান্সেই ছিলেন এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা নয়, বর্তমান ভাবনৈতিক দ্বন্দ্বেও ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট বিরোধী শিবিরের পুরোভাগে আছেন মরিয়াক। তাঁর বিরোধিতা হল আন্তরিক বিশ্বাস ও আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অন্য বনিয়াদী সাহিত্যিকদের চাইতে মরিয়াকের জীবনদর্শন সুস্থ ও সমাজনিষ্ঠ। অহংবাদী সাহিত্যিকদের প্রয়াস জীবনের মৌল অর্থহীনতার, ব্যর্থতার সুরে ভরপুর—পবিণতি হল আত্মবিলাপ এবং বিলোপ। মরিয়াকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীনপন্থী তাঁর জীবন-সত্য সংকীর্ণ যদিও বা হয়, তবু তার মধ্যে বলিষ্ঠ আদর্শ এবং দায়িত্ববোধ আছে। ইউরোপীয় এবং মার্কিণ বুদ্ধিজীবী মহলে মরিয়াকের বর্তমান ভূমিকাই বেশী সমাদৃত হচ্ছে। তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে 'নিউইয়র্ক টাইমস্' সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন, 'স্বাধীনতার সমর্থক

হিসাবেই মরিয়াক বর্তমানে খ্যাত হয়েছেন, সমকালীন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীর পক্ষে যা স্বাভাবিক—সাহিত্য এবং রাজনীতিতে মরিয়াক সমানভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন।'

উৎকৃষ্ট কথা-সাহিত্যিক হিসাবেই মরিয়াকের প্রধান পরিচিতি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। বোর্দোর এক স্বচ্ছল, প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারে ৬৬ বৎসর পূর্বে তাঁর জন্ম। মাটির টান মরিয়াকের জীবনে এবং সাহিত্যেও প্রবল; এখনও তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও সাংবাদিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফিরে যান গ্রামের বাড়িতে এবং সেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রধান কেন্দ্র। মরিয়াকের উপন্যাসগুলির পটভূমিকা হ'ল বোর্দোর গ্রাম ও সহর অঞ্চল। 'বুর্জোয়া' শব্দটি একাধারে শ্রেণী-চিহ্ন এবং নিন্দাসূচক। এমন কি অরাজনৈতিক মহলেও, বিশেষ করে ফ্রান্সে। বুর্জোয়া অর্থাৎ বিত্তশীল জীবনযাত্রা বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে মরিয়াক সিদ্ধহস্ত। ৪৩ বৎসর পূর্বে মরিয়াকের সাহিত্যিক জীবন সুরু হয় কবিতা দিয়ে। এর পর উপন্যাসের পর উপন্যাসে তিনি এঁকে চলেন বোর্দোর বিত্তশীল, সম্ভ্রান্ত সমাজের ঐহিক কামনা ও লোভে জর্জর নানা পরিবারের কাহিনী ও চরিত্র-চিত্র। ফরাসী মননশীলতার অদ্ভুত গুণ হ'ল সংশয় এবং শ্লেষের সঙ্গে মানবিকতার দীপ্তি। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের স্বচ্ছল সম্পত্তিবান পরিবার-জীবনের যেসব চিত্র মরিয়াকে এঁকেছেন, তার নির্মম বাস্তবতা অবাক করে দেয়। পাপের চেতনা ও প্রলোভন যেন মরিয়াকের সৃষ্ট চরিত্র-গুলির রক্তে-মাংসে মিশে আছে। এই পাপ এবং প্রলোভনের প্রতীক হ'ল উগ্র দেহ-কামনা ও অর্থলোভ। বলা যায় না, মরিয়াক এই পাপনুরক্তির সমর্থক কিনা। আঁদ্রে জিদ অভিযোগ করেছিলেন, মরিয়াক ঈশ্বরে অনুরক্তির সঙ্গে ঐহিক আসক্তির বেশ একটা আপোষ করেছেন। মরিয়াক বলবেন, সেই হল জীবন-সত্য; আর শিল্পী হিসাবে তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী। তিনি জানেন ধর্ম ছাড়া এই আদিম পাপ থেকে ত্রাণ পাওয়ার পথ

নেই,—না গণতন্ত্রে, না কম্যুনিজমে। জাক মারিতঁ্যা মরিয়াকের সমর্থনে বলেছিলেন, দেহ এবং আত্মার চিরন্তন সংঘাত, পশু ও দেবতার মিশ্রণকে অস্বীকার করে গোঁজামিল দেবার চেষ্টা বৃথা। ফ্লবেয়ার থেকে মরিয়াক পর্যন্ত ফরাসী কথা-সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, আদম এবং ইভের মতই মানুষের পতন ঘটছে, দ্বিতীয়বার এবং প্রতিদিন। মরিয়াকের কথা-সাহিত্যে তারই নির্মম, নিরানন্দ এবং চূড়ান্ত স্বীকৃতি। মরিয়াক কি মানুষকে ভালোবাসেন—তার সমস্ত ভালোমন্দ, মহৎ প্রচেষ্টা ও মহতী বিনষ্টি মিলিয়ে? হয়ত ভালোবাসেন। কিন্তু সে ভালবাসা বোধ হয় শিল্পীর নিরাসক্ত ভালবাসা; সে ভালবাসার মধ্যে মানুষেব কোন মহৎ সম্ভাবনায় বিশ্বাস নেই। মবিয়াকেব স্লষ্ট একটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র 'তেরেস'; দুর্ণিবার অর্থলোভ হ'ল তেবেসেব প্রণয় ও বিবাহের প্রেরণা। বালজাকের ইউজেন গ্রাঁদে যেমন অর্থলোভী মরিয়াকের 'সাপেব বাথান' (ভাইপারস্ ট্যাঙ্গল) এব নায়কও তেমনই মহাবিষয়ী। তেরেস এবং 'সাপেব বাথানের' নায়ক অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায়, প্রাণের গভীব অতৃপ্তিতে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠবার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব মহত্ত্বের প্রতীক হয়েছে মরিয়াকের উপন্যাস দুখানিতে।' মরিয়াকের স্লষ্ট এই দুইটি চরিত্রের তুলনা নেই। এরা মরিয়াকের নিজের মহাজাগতিক বিষাদ ও অতৃপ্তির কায়াময় রূপ। মরিয়াক এদের চরিত্র ব্যাখায় বলেছেন, এরা ভয়াবহ—তেরেস তার পরিবেশ, রুদ্ধশ্বাস পারিবারিক আবহাওয়াকে ধ্বংস করার জন্য তার স্বামী বার্ণার্ডকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কন্যার মঙ্গলের জন্য আত্মদান করল; 'সাপের বাথানের' বিষয়-লোলুপ বৃদ্ধ লোভ জয় করল মৃত্যুবরণ করে—এই ভয়াবহ নীচতায় স্বার্থপরতায়, যৌনবিকারে পঙ্কিল পরিবেশকে মরিয়াক ঘৃণা করেছেন আবার শিল্পীর সহানুভূতি দিয়ে এঁকেছেন, তাদেরই অপরূপ চিত্র যারা কুশ্রীতায়, কামনায় জর্জরিত হয়েও এই পরিবেশকে মেনে

নেয়নি, ঘৃণা করেছে, বিকৃত উপায়ে হলেও প্রতিবাদ করেছে।

বদ্ধ জলের মত স্রোতহীন, অন্ধকারময় বোর্দোর সংকীর্ণ, কুটিল পরিবার-জীবন ও তার পরিবেশ মরিয়াক ফুটিয়ে তুলেছেন অসংখ্য নাটকীয় ঘটনা ও সংলাপের মাধ্যমে। এই জীবন ও পরিবেশের প্রতি মরিয়াকের বিরাগ প্রবল, ঘৃণা ও সংশয় উচ্চারিত, কিন্তু তেমনই গভীর শিল্পীর অনুরাগ। কেবল চরিত্রের প্রতি নয়, দক্ষিণ ফ্রান্সের সমতলভূমি, পথ, মাঠঘাট, পাইন-বন, নির্ঝর, প্রকৃতির মোহময় আবেশ এবং প্রাচীন পরিবারের ঘরবাড়ির অদ্ভুত সৌরভ ও বিষয় দীপ্তি মরিয়াকের নিপুণ কলমের আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বর্ণনায়, শব্দচয়নে মরিয়াকের অসাধারণ মিতব্যয়িতা—শ্রেষ্ঠ ফরাসী রচনাশৈলীর উত্তরাধিকারী তিনি। লোটির কলমের রেখায় রেখায় যেমন সমুদ্র এবং বহুদূর দেশ-দেশান্তরের চিত্র জীবন্ত, তেমনি ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চল মরিয়াকের লেখায়।

মরিয়াকের কথা-সাহিত্যে সুগঠিত কাহিনী থাকলেও তা সহজপাঠ্য নয়, সুখকর হওয়া ত অসম্ভব। দুঃখবাদ ও সংশয় মরিয়াকের শিল্পী মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। মাঝে মাঝে এরও ব্যতিক্রম আছে বৈকি। পারিবারিক জীবনের কুটিল স্বার্থপরতা, ব্যক্তিমনের কামনা ও বিকার মরিয়াক তাঁর বিরাগ ও অনুরাগ মিশিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে। তবে কখনও কখনও তাঁর সংশয় ও ঘৃণায় ছেদ পড়েছে, পারিবারিক জীবনের মহত্ত্ব ও মাধুর্যের সন্ধান যেন তিনি পেয়েছেন। তবু মোটের উপরে ভগ্নাংশের গোষ্পদে মরিয়াক জীবন-সত্যের যে খণ্ড-রূপ দেখেছেন, তাতে মানুষের মহত্ত্বের আশা ও সম্ভাবনার চিহ্ন কম। 'ভালবাসার মরুভূমি' (ডেজার্ট অফ্ লাভ)তে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের চরম নিঃসঙ্গতা; বিকৃত যৌন-আবেগ ও শান্তিহীন বিবাহ--সম্পর্কের মর্মান্তিক কাহিনী তাঁর 'জেনে ট্রিক্স' ও 'অগ্নিনদী' (রিভার অফ্ ফায়ার) উপন্যাসে। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের আদিম পাপই তার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করেছে। অধঃপতনের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই আশাহীন অধ্যাত্মতত্ত্ব নানাভাবে মরিয়াকের

শিল্পদর্শনে প্রতিফলিত হচ্ছে। 'ভালবাসার মরুভূমি'ই সম্ভবতঃ মরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সম্প্রতি তিনি যা লিখেছেন, তাতে তাঁর দুঃখবাদ ও অতৃপ্তির সঙ্গে মিশেছে রাজনৈতিক মতবাদ। গত বৎসরে প্রকাশিত 'লা সাগু'ই' ('লিট্‌ল মিজারী') রচনাকৌশলে প্রশংসনীয় হলেও, কাহিনী হিসাবে ব্যর্থ। অভিজাত পরিবারের সংকীর্ণতা, সাধারণ ঘরের মেয়ের ঐশ্বর্য ও মর্যাদা-লোভ, ব্যর্থ-বিবাহ, পিতামাতার মনোমালিন্যে পীড়িত শিশু এবং এর সঙ্গে একটি কম্যুনিষ্ট শিক্ষকের শ্রেণী-বিদ্বেষ মিলিয়ে উপন্যাসের ছকে একটি ছোট গল্পের কাহিনী ব্যবহার করেছেন মরিয়াক। আদর্শ-সংঘাত বর্ণনায় মরিয়াক শিল্পীজনোচিত নিরপেক্ষতা রাখার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন নিঃসন্দেহে। তবু সমালোচকেরা উপন্যাস হিসাবে এই কাহিনীর সার্থকতা মেনে নিতে পারেন নি। বিশ ত্রিশ দশকে মরিয়াক যে উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলি কাহিনী, গঠন কৌশল এবং গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মরিয়াকের সাম্প্রতিক লেখা এগুলির সঙ্গে তুলনার যোগ্য নয়। মরিয়াকের সাহিত্য প্রতিভায় এখন অবসাদের লক্ষণ, হয়ত দিকভ্রান্তিরও। বালজাক যে অর্থে ফরাসী শিল্পী মানসের প্রতিনিধিত্ব অর্জন করেছিলেন, মরিয়াক সে অর্থে সমকালীন ফরাসী সাহিত্যের পুরোধা নন, কোন সমকালীন সাহিত্যিকই তা নন। অভিজ্ঞতার বিস্তারে, গভীরতায়, মানবতার দীপ্তি ও চেতনায় একদা যে সাহিত্য মহত্ব ও সর্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিল, সে সাহিত্যে সৃজনের প্রচেষ্টা এখন স্তিমিত, ব্যাহত। ফ্রান্সে এবং অন্যত্রও। মরিয়াক শ্রেষ্ঠ শিল্পী, না হলে ও, উৎকৃষ্ট শিল্পী একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

১৩৫৯

টমাস ম্যান

নিঃসংশয়ে 'গ্রেট' বলতে পারা যায় এমন আর একটি প্রতিভার অবসান হ'ল। রম্যাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ড শ, টমাস ম্যানের পরে 'গ্রেট' মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য আর কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ।

বিশেষণে সবিশেষ পরিচয় দিয়ে লাভ নেই, কারণ এ যুগের পাঠকেরা টমাস ম্যানকে ভুলতে শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই। সে বোধ হয় ১৯৩৬ সনের কথা; কনোলী লিখেছিলেন, টমাস ম্যান যেন এক হারান মহাদেশের প্রতিনিধি; তাঁর কল্পিত কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতের বলে মনে হয়। কথাটা অনেক অংশে ঠিকই বোধ হয়। এক বিস্মৃত দেশের বিস্মৃতপ্রায় শিল্পীশ্রেষ্ঠ টমাস ম্যান। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তাঁর 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' (১৯২৪) জাদুকরী মায়া মুগ্ধ করেছিল অনেককেই, যেমন করেছিল এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এখনও মনকে দোলা দেয়—কাব্যের নির্বিশেষ গুণ সেটা। 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' পরিবেশ, চরিত্র-চিত্র ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এখন মনে হয় ইতিহাসের বিষয়—ইউরোপীয় মানসের একটা যুগের পরিচয়। ইতিমধ্যে আরো এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, ইউরোপের দেহ দীর্ণ হয়েছে, তার মেজাজ বদলেছে, মনে জমেছে ক্লান্তি এবং অবিশ্বাস। ভবিষ্যৎ নিয়ে, কেন বেঁচে আছি, কী নিয়ে বাঁচব, এমন সব চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে ইউরোপের পশ্চিমপাড়ায় মাথা ঘামানোর উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকতে পারলেই যথেষ্ট, এই হল ইউরোপীয় মানসের বর্তমান 'মুড'। টমাস ম্যানের জীবনজিজ্ঞাসা বড় সুদূর, হারান এক অতীতের স্বপ্ন বলে এখন মনে হলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই।

'ম্যাজিক মাউন্টেনের' ম্যাজিক বিস্মৃতপ্রায়; হয়ত 'বুডেনব্রুকসের' পরিচ্ছন্ন আঁটসাঁট কাহিনীর সহজ আকর্ষণ এর চাইতে এখনও দীর্ঘস্থায়ী। 'বুডেনব্রুকস' (১৯০১) একদা জার্মাণ 'ফরসাইট সাগা' বলে খুব সমাদর পেয়েছিল, টমাস ম্যানের সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। 'বুডেনব্রুকস' একটি যুগের পারিবারিক পুরাণ—সমাজের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সমৃদ্ধি ও অবনতির সুবিস্তৃত কাহিনী। তবে বুডেনব্রুক ও ফরসাইটদের পরেও সমাজ-জীবনে আবো ওঠানামা চলেছে, ইউরোপে এবং অন্যত্রও। কোন কোন সমালোচক এর উল্লেখ করে বলেছেন, বালজাকের সমাজ-দর্পণের মত টমাস ম্যান ও গল্‌সওয়ার্দির উপন্যাস দুখানিও যুগচিহ্নিত এবং সেইজন্য এখনকার পাঠকের কাছে জেম্‌স ফ্যারেল অথবা প্রিস্টলে, মরিয়াক কিংবা স্টাইনবেক বেশী আকর্ষণীয় হতে পারে।

সময় এবং রুচির পরিবর্তন ছাড়া আরো কারণ আছে। 'বুডেনব্রুকস' অথবা 'ম্যাজিক মাউন্টেন' শুয়ে শুয়ে পড়বার মত উপন্যাস নয়। একে ত ডবলডেকার উপন্যাস এখন অনেকের কাছেই ভীতিপ্রদ, তার উপর তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের প্রতি অনুরাগ শীতল হয়ে এসেছে। টমাস ম্যান নয়, সমারসেট ম্যম এ যুগের মাথাধরার সস্তা ওষুধ। একজন হলেন জ্ঞানী—শুদ্ধমাত্র গল্প বলে সন্তুষ্ট নন, গ্যেটের মত মহৎ মানবিক বেদনার বাণীবাহক হবার প্রয়াস তাঁর আজীবন ; আর একজন পরিপাটিভাবে গল্প বলায় সিদ্ধহস্ত, অবকাশ রঞ্জনের সফল শিল্পী। টমাস ম্যানও ছোট গল্প লিখেছেন প্রচুর, ছোট গল্প লিখিয়ে হিসাবেই তাঁর সাহিত্যিক-জীবন শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তাঁর অধুনাতন রচনা দীর্ঘ ছোট গল্প 'দি ব্ল্যাক সোয়ান' (১৯৫৩)। টমাস ম্যান ছিলেন একাধারে গ্যেটে এবং হ্বাগনারের অনুরাগী। শিল্পের সর্বজনীন কর্তব্য সম্বন্ধে গ্যেটের মতই তাঁর আদর্শ খুব উঁচু, প্রায় দর্শনের সামিল। নিজেকে গ্যেটের যোগ্য উত্তরাধিকারী কল্পনা করে কিছু অহমিকাবোধও তাঁর ছিল। এর উপরে হ্বাগনারের উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীত-প্রেরণা, নোভালিসের অন্তরাশ্রয়ী

আবেগ আর শোপেনহাউয়েরের মহাবিষণ্ণতার দর্শন, সব কিছু মিলিয়ে টমাস ম্যানের কল্পনাকে বিস্তৃতি দিয়েছিল, কিন্তু গ্যেটের মত পরিপূর্ণ প্রশান্তি দিতে পারে নি।

টমাস ম্যান জাত-রোমান্টিক। বুডেনব্রুকসও ত স্মৃতি-মন্থন—যে সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, যে সমৃদ্ধ সভ্যভব্য সওদাগর শ্রেণীর বিলয় ঘটছে, তার নষ্ট স্বপ্নের অপরূপ চিত্রশালা। হাইনরিখ ম্যান ও টমাস ম্যান দুই ভাই; দুজনেই শক্তিমান কথাশিল্পী, কিন্তু বিপরীতধর্মী। হাইনরিখ ম্যানকে জার্মাণীর সমাজচিত্র আঁকায় ফরাসী কথাশিল্পী এমিল জোলার সমতুল্য বলা হয়। টমাস ম্যানকে কারো সঙ্গে তুলনা করা কঠিন। 'বুডেন ব্রুক্স্' 'ফরসাইট সাগাব' সমজাতীয়, কিন্তু গল্সওয়ার্দির সমাজ চিত্র নিতান্ত এক রঙা আর টমাস্ ম্যানের চিত্রে বিচিত্র বর্ণসমারোহ, কাহিনীব পর্বে পর্বে বিস্ময়কর আবেগের সুরঝঙ্কার। ম্যানের প্রায় সব গল্পে এবং উপন্যাসেই শোপেনহাউয়েরের মহাবিষণ্ণতাব প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি; জীবনের যে রূপটা তিনি তুলে ধরেছেন বারে বারে, তার মধ্যে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই; আছে অপূর্ণতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষয় আর মৃত্যুর অনিবার্য গতির নিপুণ চিত্রকল্প, আর আছে মন্থর, কখনও কখনও ক্লান্তিকর, বিষাদ-গম্ভীর বর্ণনায় হ্বাগনারের মত গীতিময় সুরসঙ্গতি। তাঁর উপন্যাসের ভাবতরঙ্গ ওঠানামা করে বর্তমান থেকে অতীতে, আবার অতীত থেকে বর্তমানে; ঘটনা ও চরিত্র, দুয়েরই গতি সুরের কুণ্ডলীর মত বৃত্তাকারে। বুডেনব্রুক পরিবারের যখন সুদিন, তখন শহরের কবি সওদাগরদের প্রশস্তি জানাচ্ছেন গান গেয়ে। কাহিনীর শেষ পর্বেও গান হচ্ছে; বুডেনব্রুকদের সমৃদ্ধির বনিয়াদ ভেঙে পড়েছে, শৃঙ্খলা ও শোভনতার বনেদী নিয়মকানুন বুডেনব্রুকদের কাছেও এখন অর্থহীন—বাড়ির কর্ত্রী এক সন্দেহজনক লেফ্টন্যান্টের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছেন। পরিবারের পাকা খাতায় পূর্বপুরুষেরা নির্দেশ লিখে রেখে গিয়েছিলেন—বুডেনব্রুকদের জীবনের ব্রত হবে সফল হওয়া। যে পাতায় লেখা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল হ্যানো তার উপরে আড়াআড়ি দাগ টেনে পরিবারের বনেদী

সিদ্ধি ও সফলতার পুরাণের উপসংহার রচনা করল। ক্ষয় এব মৃত্যুর চেতনা টমাস ম্যানের প্রায় সব কাহিনীকেই এক সুমহৎ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করেছে। বুডেনব্রুকসে পরিবারের সফলতার মন্ত্র জপে সিদ্ধি পেয়েছিলেন কন্সাল টমাস, কিন্তু ভাঙনের প্রতিরোধ করতে পারেন নি। অন্তিম মুহূর্তে টমাসের সান্ত্বনা হল শোপেন-হাউয়েরের বাণী—মৃত্যুই চরম সার্থকতা, মৃত্যু হল বিশ্বের সঙ্গে বিলয়।

সময়ের গতিস্রোত এবং আবর্তন সম্বন্ধে ম্যানের সচেতনতা প্রুস্তের মতই প্রখর। তবে প্রুস্ত কোনো তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যস্ত হন নি, তাঁর কল্পরাজ্যে শুধু সময়ের তরঙ্গ আর মনের গহনে নানা রংএর মুহূর্ত বুদ্বুদ। গ্যেটের উত্তরাধিকারী টমাস ম্যান স্বভাবতই আরো বেশী গম্ভীর, চিন্তাশ্রয়ী। তবে কখনও কখনও প্রুস্ত এবং জিদের মত তিনিও সমকামিতার যৌন-বিকার নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক রোমান্স রচনা করেছেন—'দি ডেথ ইন ভিনিস' ও 'টোনিওক্রোগার'-এর কথাবস্তু হল ওই।

কল্পনার বিশালতায়, শিল্পকৌশলে টমাস ম্যানের সৃজনী প্রতিভার মৌলিক নিদর্শন 'ম্যাজিক মাউন্টেন'। এখানে এই জাদুকরী পাহাড়ের চূড়ায় মৃত্যুর ছায়া সর্বব্যাপী, গভীর; তাই জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র ব্যাকুলতায় স্পন্দিত, মুখর পাহাড়ের চূড়ায় ক্ষয়রোগীদের স্বাস্থ্যনিবাস। ব্যবসায়ী পরিবারের সাধারণ আটপৌরে বুদ্ধির তরুণ হান্স ক্যাস্টরপ এসেছিল এখানে তিন সপ্তাহের জন্য, দেখা হল অনেক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষের সঙ্গে। মৃত্যুর রাজ্যে ওডিসীর মতো হান্স ক্যাস্টরপের প্রবেশ; তারপর পাহাড়ের জাদুকরী মায়া তার মন হরণ করল, তিন সপ্তাহ থেকে সাত বৎসর কাটল এখানে। এখানে সময় সময়হীন, ঘটনা অঘটনীয় জীবনের প্রতি, পাহাড়ের নীচে শক্ত মাটির পৃথিবীর প্রতি, এই জাদুকরী জগতের অগাধ অবজ্ঞা। হান্স ক্যাস্টরপের আত্ম-জিজ্ঞাসার অনুশীলন শুরু হল নানা অদ্ভুত মানুষের সংস্পর্শে—

যুক্তিবাদী সেত্তেমব্রিনী, জেসুইট ন্যাফটা, জৈবিক কামনার প্রতীক ক্লাভডিয়া, স্বচ্ছদৃষ্টি পিপারকর্ন, সকলের কাছ থেকেই ক্যাস্টরপ জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধানের ইঙ্গিত সন্ধান করল। টমাস ম্যান অবশ্য নিরাসক্ত, সকলকেই দেখেছেন এঁকেছেন দেবতা-সুলভ প্রচ্ছন্ন পরিহাসনিপুণতার সঙ্গে। ক্যাস্টবপের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হল আকাশের গায়ে মৃত্যুর রাজ্যে। জাদুকরী এই পাহাড় জীবনের ব্যঙ্গানুকৃতি, এখানে জীবনের বিকার—শুধু তত্ত্ব এবং তর্ক, ব্যাধি ও বিষণ্ণতার উপসর্গ চর্চা। ক্যাস্টরপ ফিরে গেল কঠিন মাটিতে মৃত্যুর রাজ্য থেকে। উপন্যাসের সমাপ্তি যুদ্ধের দৃশ্যে—বণক্ষেত্রে ক্যাস্টরপ, প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে। টমাস ম্যানের কল্পনা এর বেশি অগ্রসর হতে পারে নি। জার্মাণ 'কুলটুরের' মোহাচ্ছন্ন টমাস ম্যান এই সময়ে জার্মাণ রাষ্ট্রের বলদৃপ্ত শক্তির উপরে শ্রদ্ধাশীল, রাজতন্ত্রের সমর্থক। 'ম্যাজিক মাউন্টেনে'জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান অপূর্ণ, সঙ্গতিহীন।

টমাস ম্যানের কাহিনী, চরিত্র, ঘটনাবিন্যাস ছায়াময়, যেন কোনো এক অলৌকিক মনোরাজ্যের চিত্র, প্লেটোর সেই গুহায়-বর্ণিত অশরীরী মূর্তি সব, যাদের বাস্তব রূপ আমাদের নাগালের বাইরে, কল্পনার আলোয় উদ্ভাসিত ছায়ার মিছিল শুধু আমরা দেখতে পাই। এই জন্য টমাস ম্যান সহজ নয়, জনপ্রিয় নয়। ম্যানের লেখায় আর যত গুণই থাক না কেন, বর্ণনা ও বাচনভঙ্গীর সহজ চমৎকারিত্ব খুব বেশী নেই। এক কথায় তার বৃহদায়তন উপন্যাসগুলি সেকেলে গৃহিণীদের গহনার মত নিরেট সোনা, হালফ্যাশনের হাল্কা জিনিস নয়।

এ যুগের কেস্‌লার টমাস ম্যানকে দেখে খুশী হতে পারেন নি, বলছেন—টমাস ম্যানের নজর বড় বেশী উঁচুতে, মানবপ্রেমিক হয়েও তিনি মানুষের কাছাকাছি নন। হয়ত কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, ম্যানের প্রতি কেস্‌লারের বিরূপ মনোভাবের কিছু রাজনৈতিক কারণ থাকা অসম্ভব নয়। টমাস ম্যান পশ্চিম জার্মাণীর পুনরস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ঘোষণা করেছিলেন গত বৎসরে; উপরন্তু নাৎসী জার্মাণী

ও সোভিয়েট রাশিয়া দুই-ই সমান খারাপ ও নিন্দার যোগ্য—কেসলারের এই অভিমত টমাস ম্যান সমর্থন করেন.নি। তবে একথা ঠিক ম্যানের সাহিত্যিক আদর্শ এবং প্রয়াস ছিল অনেক উঁচুতে উঠবার, যেখান থেকে মানুষকে পৃথিবীকে দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। 'ওলিম্পিয়ান' অর্থাৎ পর্বতচূড়ায় সমাসীন বিশেষণটি এ যুগে বোধ হয় একমাত্র টমাস ম্যানকেই দেওয়া যায়। তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইত্যাদিতে অবশ্য টমাস ম্যানের অন্য পরিচয়ও পাওয়া যায়। নাৎসীদের আমলে তাঁকে স্বদেশ ছাড়তে হয়েছে, যুদ্ধান্তেও তিনি দেশে ফিরে যান নি। 'ওলিম্পিয়ান' কথাটিতে ফিরে আসা যাক। জীবন-বিমুখ নয়, জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্ত, বন্ধনমুক্ত হতে হবে এই আদর্শের প্রেরণা ম্যান পেয়েছিলেন নীটশে ও নোভালিস থেকে। ইতিহাসের পরিহাস বলতে হবে, যুদ্ধে, রাজনৈতিক বিপর্যয়ে এমন নিরাসক্ত ওলিম্পিয়ান শিল্প-সাধকেরও ধ্যানভঙ্গ করেছিল।

গ্যেটে ও হ্বাগনারের জার্মাণী গ্যেটের উত্তরসাধক টমাস ম্যানের চোখের সামনেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ভার্দুনের রক্তক্ষয় আর ভার্সাই-এর ব্যর্থতা এই বিরাট বিপর্যয়ের তুলনায় পিনের আঁচড় মাত্র। তা সত্ত্বেও টমাস ম্যান ৮০ বৎসর পর্যন্ত নিরাসক্ত শিল্প-সাধনা করতে পেরেছিলেন, আর্নস্ট টলার ও স্টেফান ৎসাইগের মত আত্মঘাতী হয়ে 'ঈশ্বরের প্রবেশপত্র' ফিরিয়ে দেন নি। মনে হয়, গ্যেটের আত্মসমাহিতি কিছুটা অর্জন করেছিলেন টমাস ম্যান। এর ফলে তাঁর শিল্প-সাধনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগাযোগ সম্ভবত শিথিল হয়েছিল। টমাস ম্যানের ত্রিশ বৎসরের গল্প সংগ্রহের সমালোচনা প্রসঙ্গে কনোলী মন্তব্য করেছিলেন ম্যানের একটি গল্পেও আভাস পর্যন্ত নেই যে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মাণীতে অগণিত মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘটেছিল। 'আর্লি সরো' 'ডেথ ইন ভিনিস', 'টোনিওক্রোগার' ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব-প্রধান ছোট গল্প। জীবনের বহিরঙ্গ থেকে সেইটুকু মাত্র ম্যান

নিয়েছেন যা গল্পের মূল সুরকে সামঞ্জস্য দেয়। তাঁর 'দি ব্লাক সোয়ান'-এর ('১৯৫৩) ঘটনা সংস্থান হল প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মাণীতে। কিন্তু এর কাহিনীতে এই যুদ্ধোত্তর জার্মাণীর দুর্গতির ছায়া সামান্যই পড়েছে। বিগতযৌবনা রোজালির সহসা উদ্দীপ্ত দেহকামনার মর্মান্তিক পরিণতি হল গল্পের বিষয়বস্তু। শেষ কয় পাতার বর্ণনা হুবহু ডাক্তারী জর্নালের মত। আশী বৎসর বয়স পর্যন্ত টমাস ম্যানের অশ্রান্ত লেখনী তাঁর প্রতিভার যোগ্য শিল্প-বৈভব সৃষ্টি করেছে। গত বৎসরে লেখা তাঁর উপন্যাস 'ফেলিক্স ক্রুল' এক ধূর্ত ভাগ্য-সন্ধানীর কাহিনী, এর পরিহাস ও ব্যঙ্গরসোচ্ছল গল্প ও চরিত্রের সাবলীল গতি জার্মান পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পীর মনোজগতের দ্বন্দ্ব নিয়ে, সৃজনী প্রতিভার রহস্য অনুসন্ধানে ম্যানের কৌতূহল ছিল অসীম। 'লট ইন হ্বাইমার'-এ (১৯৩৯) টমাস ম্যান গ্যেটে-প্রতিভার মহিমাময় পরিপূর্ণতার চিত্র এঁকেছেন; তবে এখানেও কাহিনী নয়, ভাব এবং তার অনুষঙ্গই প্রধান। ঘুরে ফিরে সেই দার্শনিক তত্ত্ব, জৈব প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সৃজনী আবেগের বিরোধ—প্রকৃতিকে জয় করে নিরাসক্তির সাধনা হল শিল্পীর সমস্যা এবং মহৎ বেদনাময় প্রয়াস। ম্যানের এই ধরনের উপন্যাসগুলি তত্ত্বপ্রধান রূপক, সেজন্য কিছু গুরুভার এবং গুরুপাকও। একই তত্ত্ব 'ডক্টর ফাউস্টাসে' (১৯৪৭) দেহের সঙ্গে আত্মার বিরোধ, প্রকৃতির সঙ্গে সৃষ্টির। এই উপন্যাসে ক্ষয় ও মৃত্যুর বিষণ্নতা শিল্পীর সৃষ্টি কামনার আলোতে অপরূপ শোভাময়, তা ছাড়া কাহিনীর স্তরে স্তরে জার্মাণীর ঐতিহাসিক বিপর্যয়েরও বিশ্লেষণ ম্যান করেছেন। ভারতীয় পৌরাণিক উপাখ্যানকে ভিত্তি করে ম্যান রচনা করেন 'দি ট্র্যানসপোজড্ হেডস' এই কাহিনীর তত্ত্ব-বস্তু হল দেহ এবং আত্মার ঐক্য রচনা। সীতার স্বামী শ্রীদমনের দেহ অসুন্দর, আত্মা উজ্জ্বল। শ্রীদমনের বন্ধু নন্দের আত্মিক গুণ নেই, কিন্তু তার আছে বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ। সীতার দুই-ই চাই। মূল উপাখ্যানের সুখময় পরিণতি হয়েছিল নন্দের দেহের উপরে শ্রীদমনের মাথা বসিয়ে দিয়ে।

টমাস ম্যানের কাহিনীতে এখানেই শেষ নয়—সীতা, শ্রীদমন ও নন্দ কেউই এতে সুখী হতে পারে না। তাই তারা সহজভাবেই মৃত্যুকে বেছে নেয়, আর ভবিষ্যতের সমন্বয়ের আশ্বাস থাকে তাদের তিনজনেরই সন্তান, সমাধি।

বাইবেলের জোসেফকে নিয়ে লেখা উপন্যাস চতুষ্টয় তত্ত্বপ্রধান জটিল রূপক। বাইবেলের মহামানব জোসেফকে টমাস ম্যান করেছেন সমস্যাপীড়িত আধুনিক মানুষের প্রতিরূপ। তাঁর জোসেফ-কাহিনীর মর্মকথা হল, এ যুগের অশান্তি ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান সমাধান আদিম জীবনের সরলতা শক্তি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি ফিরে পাওয়া। চার খণ্ড উপন্যাসে সম্প্রসারিত না করে একটি মাত্র প্রবন্ধেও এ কথা বলা যেত, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ম্যানের বক্তব্য সহজ ও হৃদয়গ্রাহী, কাহিনীর দীর্ঘ মন্থর বিলম্বিত গতি এবং রূপকের জটিলতা পাঠকের মনকে শুধু ভারাক্রান্ত করে। কেস্‌লারের অনুযোগ একেবারে মিথ্যা নয়, মানব-প্রেমিক হলেও সাধারণ মানুষের প্রতি টমাস ম্যানের অনুকম্পা সুদূরচারী মনে হয়।

টমাস ম্যানের অনুরাগী কোনো কোনো সাহিত্যরসিক এক সময়ে তাঁকে টলস্টয়ের সমতুল্য বলেছিলেন। টলস্টয়ও নানা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তবে তাঁর কোন উপন্যাসই তত্ত্বপ্রধান নয়, রূপকোপাখ্যানও নয়। কিছু ছোট গল্প মাত্র নীতি-উপাখ্যান জাতীয়। 'ওয়র য়্যাণ্ড পীস' অথবা 'য়্যানা ক্যারেনিনা'র পটভূমিতে, চরিত্র সমাবেশে তত্ত্বের ছক নেই, ম্যানের মত আত্মগত রোমান্টিকতার ভাব-মূর্চ্ছনা নেই। টমাস ম্যানের কৌতূহল কল্পনাশক্তি এবং পর্বত প্রমাণ (জার্মাণ) বিদ্যাবত্তা বিস্ময়কর। কিন্তু টলস্টয় আরও বেশী মননশীল স্থিতধী এবং বস্তুনিষ্ঠ। একজন শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্মাণকৌশলের সঙ্গে আরেকজনের বিশিষ্ট গুণের তুলনা করলে অবশ্য অবিচার করা হয়। টমাস ম্যান টলস্টয় নন, প্রমাণ করায় কোন সার্থকতা নেই। জেমস জয়েস ও প্রুস্ত যেমন এই শতাব্দীর কথাশিল্পে মৌলিক প্রতিভা, টমাস ম্যানও সেইরকম। 'বুডেনব্রুকস' এবং 'ম্যাজিক মাউণ্টেনে'র

আবেদন 'ওয়র য়্যাণ্ড পীস' ও 'য়্যানা ক্যারেনিনা'র মতো সর্বজনীন না হতে পারে, তবু ম্যানের এই দুখানি উপন্যাস বিষয়বস্তু, চরিত্রবিন্যাস ও আবহ রচনায় অভিনব। মননশীলতায়, কল্পনার বিস্তৃতি ও বিশালতায়, নির্মাণ কৌশলে অন্তত এই দুখানি উপন্যাস মহৎ ও সার্থক শিল্পকীর্তি হিসাবে টমাস ম্যানের প্রতিভাকে অবিস্মরণীয় করবে।

১৩৬২

দেশবিদেশের ছোট গল্প

ছোট গল্প ছোট হলেও তার সংখ্যা আধুনিককালে দেশে বিদেশে কম নয়। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রগুলির দিকে তাকালে অনুমান করা যায় ছোট গল্পের চাহিদা এবং চলন কি পরিমাণ। তবু এতদিনের অনগ্রসর অর্থনীতির কৃপায় আমাদের সাহিত্যিক অনুরাগ শতকরা মাত্র ১৯ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; অন্য যে সব দেশে লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা আরও ৭।৮ গুণ বেশি, অন্ততঃ সময় কাটানোর জন্যও কিছু-না-কিছু পড়ার রেওয়াজ জনসাধারণের মধ্যেও বর্তমান, সেখানে ছোট গল্পের বাজারই সবচাইতে সরগরম।

এইসব 'জনপ্রিয়' গল্পের মান অবশ্য খুব উঁচু নয়। ভাষা সরস, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনের মত করে সাজানো গোছানো প্রেমের ব্য 'এ্যাড্‌ভেঞ্চারের' কথা, খুন-জখমের কিম্বা রুচি-বিকারের অস্বাভাবিক উদ্দীপনাময় টুকরো টুকরো ঘটনা -এই ধরণের পশরায় ইঙ্গমার্কিন সাময়িক পত্রমণ্ডলীর 'শোকেস' জমজমাট। এরও ব্যতিক্রম আছে বৈকি এবং সে কথা পরে বক্তব্য। মার্কিন মহাজনেরা যাকে 'স্বাধীন পৃথিবী' (free world) বল্‌ছেন, তার উপরতলার ইঙ্গিতে ও উৎসাহে সাহিত্যের বড়বাজারী মালিকেরা যা চালাচ্ছেন, সে হল ভাবনাহীন সাহিত্য—যাকে গর্কি বলেছেন ফিলিষ্টিন সাহিত্য।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে 'ফ্রি ওয়ার্লডের' আদর্শ কি ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে সে বৃত্তান্ত একজন বনিয়াদী মার্কিন সাহিত্যসমালোচক বেশ আত্মসন্তুষ্টভাবেই বলেছেন। বর্ণনা কেবল ছোটগল্প সম্বন্ধে নয় মার্কিন বড়বাজারী সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব জীবনের সুস্থ সামাজিক প্রেরণাগুলির প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ হ'ল এর মূল সুর। মার্কিন প্রচার বিভাগের 'আমেরিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্রে সাম্প্রতিক মার্কিন কথাশিল্পীদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে

।কছুদিন পূর্বে অধ্যাপক আরউইন লেখেন, সমাজতাত্ত্বিক অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী মার্কিন সাহিত্যে পশ্চাদপসরণ করেছে, এখন আসছে স্বভাববাদ অর্থাৎ সেই অতিপরিচিত নাৎসী দেবতা 'হী-ম্যান' (he-man) ও রক্তের ডাক। আরউইনের মতে মার্কিন কথাশিল্পীরা বুঝেছেন, বাস্তব জগৎ বিশৃঙ্খল, সঙ্গতিহীন, সেইজন্যই নতুন করে স্বপ্ন, রূপকথা, ভ্রান্তিবিলাস এবং অবচেতনলোকের অসুস্থতা থেকে গল্পের উপাদান তাঁরা সংগ্রহ করছেন। একই কারণে ব্যাধি ও মনোবিকার মার্কিন কথাসাহিত্যের বড়বাজারী চাহিদা পূরণ করছে। ত্রিশ দশকে খ্যাতনামা মার্কিন কথাশিল্পী হেমিংওয়ে, ডস্ প্যাস্‌স, রিচার্ড রাইট এবং আরো অনেকে সমালোচনামূলক বাস্তববাদকে কথাশিল্পে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরা আজ মর্গ্যান সাম্রাজ্যেব বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

ওয়াল ষ্ট্রীটের ইঙ্গিতে মার্কিন কথাসাহিত্য কি রূপ নিয়েছে বা নিতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। ১৯৪৯ সালে ও' হেনরী পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান গল্পগুলি পাশাপাশি পড়লে সেটা আরও বোঝা যায়। বাংলা সাহিত্যে প্রতিক্রিয়া ও আদর্শ-বিকারের লক্ষণ তত প্রকট নয়, যতটা প্রকট 'ফ্রি ওয়ার্লডের' স্বর্ণলঙ্কায়। এটা একদিক দিয়ে অর্ধ উপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থার গুণই বলতে হবে; আমাদের বনিয়াদী সাহিত্যিকেরা এখনও মর্গ্যান সাম্রাজ্যের মত প্রবল বড়বাজারী পৃষ্ঠপোষক পাননি; উপরন্তু আমাদের বনিয়াদী সাহিত্যিকদের কাছেও দেশজোড়া দারিদ্র্য, দুর্গতি ও কুশাসন রূঢ়ভাবে সত্য; 'গণতন্ত্র' 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি তন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণেও তাঁরা বাস্তব জীবনের ও সংস্কৃতির সংকট একেবারে এড়াতে পারছেন না। প্রবীণ ও নবীন, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল কথাশিল্পীদের মধ্যে এখনও কিছু যোগসূত্র এখানে রয়েছে। সম্ভবতঃ এটা থাকতে পেরেছে আরও একটি কারণে—সে হ'ল রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সুস্থ মানবিক ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ। হিন্দী ও উর্দু ছোট গল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই;

অনুবাদে যা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় সমকালীন সামাজিক সত্য সম্বন্ধে চেতনা প্রখর হয়েছে। সমকালীন চেতনা অবশ্য আজ সব ধনতন্ত্রী দেশেই দ্বিধাবিভক্ত--ছোট গল্পেই হোক অথবা সাহিত্যের অন্য বিভাগেই হোক। সর্বত্রই একটি ধারা সাবধানী, নিশ্চিতআশ্রয়েবিশ্বাসী, প্রচলিত বিধিব্যবস্থায় সন্তুষ্ট অথবা তার প্রতি উদাসীন; অন্য ধারাটী বাস্তব জীবনের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন, পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি সংকটের সমাধানপ্রয়াসী। ১৩৫৪র বাংলা সেরা গল্পে এই দুই ধারাই লক্ষ্য করা যায়। ওদিকে ১৯৪৯ সনের মার্কিন সেরাগল্প সংকলন একেবারে সুস্পষ্টভাবেই ফিলিষ্টিন, স্নায়ুবৈকল্যের লক্ষণযুক্ত। এর আরো আগাতমনোহর পরিচয় পাওয়া যায় ফ্রান্সে—সার্ত্রে, মাতারল্যাস্ত এবং নয়া ক্যাথলিক কথা শিল্পীদের লেখায়; এঁরা বিদগ্ধ ফরাসী সংস্কৃতির বাহক, সেজন্য এঁদের গল্প, কাহিনী, ও কথাচিত্রে মার্কিনী ডলারবিকারের উগ্র ঝাঁঝ নেই। বনিয়াদী ফরাসী গল্প সাহিত্যও ফিলিষ্টিন, আত্মসর্বস্ব, কিন্তু সাধারণ মার্কিনী লেখার মত সস্তা উত্তেজনাপূর্ণ নয়। মার্কিন বড়বাজারী কথাসাহিত্যের মুখ্যবস্তু হলিউডের খুন জখম রাহাজানি ও উচ্ছৃঙ্খলতার রূপালি ছবির মতই কথাশিল্পের মার্কিনী ঢং এখন প্রসারিত হচ্ছে ফ্রান্সে, ব্রিটেনে এবং অন্য অনেক 'স্বাধীন' দেশেও; তবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের 'বিশুদ্ধ' কথাশিল্পীরা এদিক থেকে এখনও পিছিয়ে আছেন, এবং নিজেদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ভারকেন্দ্র থেকে একেবারে সরে যাননি। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সমাজসচেতন নয় কিন্তু রূপকর্ম সৌষ্ঠব পূর্ণ। সার্ত্রে, কেম্যু ও গিয়োনোর আত্মদর্শনে মার্কিনী হুল্লোড় বা উগ্রতা নেই। তবে সুস্থ সৃজনের প্রয়াসও নেই, আছে আত্মার বিলাপ অথবা ইচ্ছামৃত্যুকে অভিনন্দন। মোটের উপর আধুনিক মার্কিনী বা ফরাসী ও ইংরেজী ছোট গল্পের বাহ্যিক লক্ষণগুলি পৃথক; ইংরেজী ও ফরাসী প্রায় একাত্মক, কিন্তু দুয়েরই ফিলিষ্টিন দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন। ফরাসী ছোট গল্পের শিল্পকলা

সংযত, চটকদার উত্তেজনা সৃজনের চেষ্টা কম। ১৯৪৯ সনের সেরা মর্কিন গল্পের ২৩টীর মধ্যে ৫টী হ'ল নিরাশার রূপক, ৮টী শৈশবের নিগ্রহ নিপীড়নের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ এবং ৯টী হ'ল স্নায়ুবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্জীবন নিয়ে লেখা। প্রায় কোনোটীতেই সুস্থ মানবিকতার চিহ্ন মাত্র নেই, আছে বুদ্ধিহীনতা ও আত্মসর্বস্বতা; ভয়, ক্রোধ ও অপরাধের অনুভূতি এই মার্কিনী সেরা গল্পগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। আর সবচেয়ে সেরা, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাশিল্পী ফক্‌নার যে গল্পটী রচনা করেছেন তার প্রতিপাদ্য হ'ল রক্তের পবিত্রতা —নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সাদা মানুষের চিরন্তন বিরোধ।

মার্কিন সেরা গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হয়ত দীর্ঘ হ'ল; বিদেশের ছোট গল্পের সাম্প্রতিক ধারা অনুসরণে এই আলোচনা অবান্তর নয়। ছোট গল্পের নির্মাণকৌশল সাম্প্রতিক কালে খুব পরিবর্তিত হয়েছে বলা চলে না। সব দেশেই ছোট গল্প ছোট এবং গল্প হওয়া চাই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে নির্মাণপদ্ধতি, কাহিনী বর্ণন, চরিত্র চিত্রণে যে ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, ছোট গল্পে সেরকম ঠিক দেখা যায় না। জেমস জয়েস ইউলিসিস রচনা করেছিলেন সমস্ত উপন্যাসের উপসংহার হিসাবে। ছোট গল্পকে এভাবে সংহার করার চেষ্টা কখনও হয়েছে মনে হয় না। ছোট গল্প গীতিকবিতার মতই অনন্য। যদিচ এডগার য়্যালান পো-এর মতে ছোট গল্পের গঠন ও পরিণতি সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত, তবু টুর্গেনিভ, শেকভ এবং মোপাসাঁর হাতে ছোট গল্প কখনও কখনও সুপরিণত কাহিনী না হয়েও ছোট গল্প হয়েছে; মোপাসাঁর 'মুন লাইট' অথবা শেকভের 'গুসেভ' প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি উল্লেখ করা যায় বুদ্ধদেব বসুর 'জ্বর' গল্পটি। ছোট গল্পে জয়েসীয় স্বগতোক্তির সুযোগ ছিলই, এর স্থান গত শতাব্দীর দিক-পালেরাই করে গিয়েছেন—ডি, এইচ লরেন্স অথবা অধুনাতম এলিজাবেথ বাওয়েন ও প্রিচেট প্রমুখ লেখকেরা ছোট গল্পের বাঁধুনী আরও শিথিল করছেন বটে কিন্তু কোনো নতুন ধারা প্রবর্তন করেন নি।

ছোট গল্পের সাম্প্রতিক বিবর্তন ঘটেছে আঙ্গিকে নয়, বিষয়বস্তুতে, দৃষ্টিভঙ্গীতে। এই বিবর্তনের মৌলিক লক্ষণগুলি কিন্তু সাহিত্যের সকল বিভাগেই লক্ষ্য করা যায়, কেবল ছোট গল্পে নয়। সেইজন্য আধুনিক ছোট গল্পের কোনও স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনাকরা দুঃসাধ্য। সমসাময়িক রাজনীতি ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয় ছোট গল্পেও সংক্রমিত হয়েছে। মার্কিন কথাসাহিত্যের বড়বাজারী রূপ এই দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের একদিক মাত্র; সব ধনতান্ত্রিক দেশেই সাহিত্যিক কল্পনা, অনুভূতি ও প্রয়াস দুই শিবিরে বিভক্ত। টি, এস, এলিয়ট রায় দিয়েছেন, সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষা করবে মুষ্টিমেয় আত্মমগ্ন প্রাজ্ঞজন। অধ্যাপক রীড্ আবিষ্কার করেছেন, সেক্সপীয়ার এবং গ্যেটে তাঁদের সমকালীন সামাজিক চেতনা ও কর্মধারা দিয়ে আদৌ প্রভাবিত হননি। এই ফিলিষ্টিন সাহিত্যসূত্র এখন দেশে বিদেশের অনেক বনিয়াদী কথা-শিল্পীর সাহিত্যাদর্শ। নিরাসক্তির পীঠভূমি থেকে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তার বিকৃত মার্কিনী রূপ আমরা দেখেছি; দেখছি ফ্রান্সে তার আরও অন্তরাশ্রয়ী রূপ; ব্রিটেনে খনিয়াদী কথাশিল্পীমহলে তারই পুনরুক্তি।

কিছুদিন পূর্বে তিনজন প্রথিতনামা ইংরেজ গল্পলেখক—এলিজাবেথ বাউয়েন, প্রিচেট্ ও গ্রাহাম্ গ্রীন তাঁদের সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে পত্রালাপ করেন। সংক্ষেপে সার্ত্রের ভাষায় এঁদের বক্তব্য বলা যায়, 'hell is other people'। অগণিত সাধারণ মানুষের জীবনের আশা আশঙ্কা ও প্রয়াসের প্রতি এঁদের সুস্পষ্ট বিরাগ। প্রিচেটের সান্ত্বনা হ'ল, যে বসওয়েল কখনো 'যুগের দাবী' ('challenge of our time') নিয়ে ব্যস্ত হন নি। গ্রীন্ সাব্যস্ত করেছেন, রচনারীতির নির্ভুলতাই একমাত্র সাহিত্যিক সত্য; সুস্থ জীবনবোধ অথবা মানবিক সত্য কথাশিল্পীর কাছে নাকি অবাস্তর। এলিজাবেথ বাউয়েন বলছেন, 'সমাজ' এই শব্দটী শোনা মাত্র তাঁর আত্মা পীড়িত হয়। ত্রিশ দশকে পীড়া ছিল অন্য রকম; ধনতন্ত্রের সংকটে যখন মার্কিন ডলারের দুর্গ পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল তখন কিন্তু এঁদের মধ্যেও অনেকে জন-জীবনের

মধ্যে নূতন সম্ভাবনা সন্ধানে বাধ্য হয়েছিলেন অথবা তার প্রেরণা পেয়ে ছিলেন। ত্রিশ দশকের ইংরেজী, আমেরিকান ও ফরাসী ছোটগল্পে সম্ভবতঃ সেই প্রথম জনসাধারণের জীবন থেকে নূতন উপাদান নিয়ে নূতন সৃষ্টির প্রয়াস সুরু হয়েছিল। এখনও এঁরা লিখছেন,—বিগত দিনের স্মৃতি থেকে ছোটখাট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গল্পের গড়ন দিচ্ছেন ; অথবা প্রকৃতি জগৎ থেকে কথাবস্তু সংগ্রহ করেছেন ; নিজেকে ছাড়া আর সব কিছুতে এঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন, গণ অভ্যুদয়ের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত বোধ করছেন, কাজেই এঁদের কারও কারও মুখে বেদনাতুর স্বীকৃতি, 'I have turned to the landscape because men disappoint me।' এঁদের গল্পে বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে, গৌণ ; আঙ্গিকের কারিকুরিতে ঢাকা পড়েছে মানবতাবোধের দৈন্য। অনেক কৌশলী বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে, সরল আলাপ অথবা চমকপ্রদ বর্ণনায় গল্পের আঙ্গিকও বেশ পরিপাটী, যা পাওয়া যাবেনা সে হচ্ছে সমকালীন জীবনের ঠিকানা এবং তার মূল্যবোধ। অবসর বিনোদনের হাল্কা গল্পের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল। খ্যাতনামা বিদেশী গল্প লেখক অনেকের শ্রেষ্ঠ রচনারও সারবস্তু এখন হ'ল বিকৃত মানসিকতা, নয়, অতি মানসিকতা। সুস্থ মানবিকতা এঁদের কাছে ভয়াবহ, কারণ একে স্বীকার করতে হলেই কথা-শিল্পে সামাজিক সত্যকে রূপায়িত করতে হয়। তার চাইতে অর্ধ মানবিকতা সুবিধাজনক, উদ্ভট মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ছলে গল্পে কতকটা নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ-সংকটকেও এড়িয়ে যাওয়া যায়। কোন একজন মার্কিন সমালোচক কথাশিল্পে এই অর্ধ মানবিকতার সপক্ষে ওকালতি করে বলেছেন, বাস্তবনিষ্ঠার চাইতে বিরক্তিকর আর কিছুই হতে পারে না ; ড্রেসার, হেমিংওয়ে (একযুগ পূর্বের), এরস্কিন কল্ডওয়েলের গল্পে কালো নিগ্রো ও সাদা গরীবদের যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত নিন্দাকর ব্যাপার, সমাজের নীচুতলার এই সব মুটে মজুর ভবঘুরে বেকার ও গরীব চাষীদের উপরে ত মার্কিন সমাজের স্থিতি নির্ভর করে না।

অতএব নীচুতলার এই জঘন্য জনতার জন্য সাহিত্যিক সহানুভূতি বাজে খরচ না করাই ভাল। অতঃপর একই সুরে সুর মিলিয়ে ইংরেজ কথা-শিল্পী সমারসেট ম্যামকে বলতে শোনা যায়, জীবন বিশৃঙ্খল,কোলাহল-ময় আর মানুষ হচ্ছে আসলে একলা, সেই একলা মানুষের উপাখ্যানই কথাসাহিত্যিকের কল্পনার বিষয়। মার্কিন বড়বাজারে 'ফ্রি এনটারপ্রাইজের' প্রেরণায় অবশ্য এই মানুষ কেবল একলা নয়, উগ্র, অপ্রকৃতস্থ, আক্রমণশীল—রাজনীতি, রাহাজানি ও ব্যবসায়ের ভৈরবী চক্রের মূলাধার। মার্কিন সমালোচক তাই বিধান দিচ্ছেন, কথাশিল্পের প্রধান কর্তব্য সৃজন নয়, পাঠকের অবসর বিনোদন। বাস্তবনিষ্ঠা, সামাজিক সত্য এই সব তত্ত্ব বিশ দশকে কথা সাহিত্যে চলেছিল বটে; তখন অবস্থা ছিল অন্যরকম, সংকটের চাপে তখন মার্কিন মুলুকের মহাজনকেও মুটে মজুর ভবঘুরের পাশে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখন যুদ্ধের মুনফায় ফ্রি এনটারপ্রাইজের মোহান্তদের সুখের সময়। এখন নাকি কথাশিল্পীর কাজ হ'ল ফ্রি এনটারপ্রাইজের জয় গান। সব চাইতে ফ্রি এনটারপ্রাইজ হল গুণ্ডামি, বাটপাড়ি, রাহাজানি। অতএব পাঠকদের মনে ফ্রি এনটারপ্রাইজের বিশ্বাস অটল রাখতে হলে কথাশিল্পের কথাই হবে এই সব সংকর্মের নায়কদের নিয়ে। গল্পে এই ধরণের নায়ক সৃষ্টির সমর্থনে সমালোচক বলছেন, 'When we say that a man is a likeable rascal, we disapprove of his principles, or his lack of them but we pay tribute to his zest for living.' চোরাকারবারী ও কালোবাজারীদের উদ্দাম জীবনীশক্তিকে অভিনন্দন করা নিরর্থক নয়। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে অন্ততঃ এই প্রবোধ দেওয়া যায়, জীবনে উন্নতির সোজা রাস্তা ধনতান্ত্রিক সমাজে খোলা নেই বটে, কিন্তু বাঁকা রাস্তা অনেকই আছে। আর যাই হোক না কেন বাংলা ছোট গল্পে বা উপন্যাসে ফ্রি এনটারপ্রাইজের ঠিক এই রকম জয় জয়কার এখনও শোনা যায়নি।

ভরসার কথা, কথাশিল্পে ফ্রি এনটারপ্রাইজের রুচিবিকার ও

সমাজবিদ্বেষ আমাদের যুগের একমাত্র সত্য নয়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে 'ফ্রি ওয়ালডে র' শিল্পে ও সংস্কৃতিতেও স্থিতি ও গতির বিরোধ আজ প্রবল, নবজীবনের স্পন্দন এখানেও আজ এবং আগামী কালের সম্ভাবনাকে রূপায়িত করছে। আর 'ফ্রি ওয়ালর্ডে র' বাইরে ইতিহাসের বিপ্লবী শক্তি যেখানে সার্থক হয়েছে সেখানে সাহিত্যের রূপ আরও জীবন্ত, নবজাত সত্যের প্রেরণায় ভরপূর। সদ্য মুক্ত চীনের ছোট গল্প কিছু কিছু আমরা অনুবাদে পড়েছি। এগুলিব প্রধান গুণ হ'ল জীবনসত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যের একাত্মবোধ। যেমন সোভিয়েট কথা সাহিত্যে তেমনি চীনা ছোট গল্পেও আঙ্গিক প্রায় নিরলঙ্কার, বর্ণনা গতিময় ও সরস; ঘটনা ও চরিত্রে বাস্তব জীবন প্রবাহের পবিচয় সুস্পষ্ট আর মানুষগুলি একেবারে ছক-কাটা সতরঞ্চে সাজানো টাইপ মাত্র নয়। এই উক্তি অবশ্য নির্বিচারে সব সোভিয়েট ও চীনা গল্প সম্বন্ধে সত্য নয়। গল্পের উৎকর্ষতা কেবল প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী অথবা জনজীবন থেকে সংগৃহীত উপাদানের উপরই নির্ভর করে না। অনেক সোভিয়েট ও চীনা ছোট গল্পের 'মুড্' (mood) জীবনের প্রতি নিষ্ঠাবান বটে, কিন্তু গল্পের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কোন ভাবের তরঙ্গ নেই, ব্যাখ্যা ও বর্ণনা আছে, ব্যঞ্জনা নেই। বনিয়াদী ফিলিষ্টিন গল্প রচনায় এবিষয়ে কতক গুলি সুবিধা আছে; জীবন্ত সত্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়েও গল্পের অভ্যস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এই জাতীয় গল্প অনেক সময়ে আমাদের অতিমার্জিত বুদ্ধির বিশ্লেষণের খোরাক যোগায়। তবে এই ধরণের ফিলিষ্টিন গল্প-সাহিত্যে আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দ পাওয়া যায় কদাচিত। শিল্পী এখানে হয় নিস্পৃহ নয়ত অতি পরিচিত আবেগের সঙ্কীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ, জীবনের মূল্য-বোধে জীবন্ত বিশ্বাসের স্বাক্ষর নাই। এখানে আমরা মানুষকে দেখি নিঃসঙ্গ, হ্রস্বদৃষ্টি—কবি কল্পনার সেই মানুষ, যে লবণাক্ত সমুদ্রে এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। বহুজীবনের সাহচর্য ও সহযোগিতায় পূর্ণ মানবিকতার যে সৃজনশীল রূপ ও প্রতিশ্রুতি তার স্বীকৃতি এই ধরণের সাম্প্রতিক ছোট-গল্পে নেই।

আশ্চর্যের কথা বলতে হবে, এদিকে 'ফ্রি ওয়াল্ডের' সমাজপতিরা ঘোষণা করছেন, 'লৌহ যবনিকার' অন্তরালে মানুষের সব মানসিক প্রয়াস লুপ্ত হয়েছে, ওদিকে বিখ্যাত কথাশিল্পী টমাসম্যান বলছেন, সৃজনশীল সাহিত্য একমাত্র পূর্ব ইউরোপেই রচিত হচ্ছে। পশ্চিমে হয় দেউলিয়া শিল্পীমানসের আত্ম-ধিক্কার নয়ত উৎকট হলিউডী ব্যসনের তামস-রূপ। এই উক্তি অবশ্য আংশিক সত্য। 'ফ্রি ওয়ালর্ডে' এমন কি মর্গ্যান সাম্রাজ্যেও হাওয়ার্ড ফাষ্ট, য়্যালবার্ট মালৎস, অ্যানা সেঘারস্ এবং আরও অনেকে জনজীবনের বিচিত্র বেদনাময় সংগ্রামশীল অভিজ্ঞতা থেকে সার্থক গল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। তেমনি করছেন ফ্রান্সের প্রগতিবাদী কথাশিল্পীরা। বাংলা ছোট গল্পের সমকালীন চেতনা ও তার রূপায়ন এঁদের সমকক্ষ না হতে পারে, কিন্তু সাম্প্রতিক ইংরেজী ছোট গল্পের চাইতে শ্রেষ্ঠ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রগতিশীল ছোট গল্প সত্যিই গল্প এবং প্রগতিমূলক আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে ফিলিষ্টিন সাহিত্যের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সার্থক প্রগতিবাদী ছোট গল্পে রাজনৈতিক উত্তেজনা আর শ্রেণী বিরোধের ফর্মুলা মাফিক বর্ণনাই মুখ্যবস্তু নয়। আরাগঁর লেখা ছোট গল্প সংকলন—'ফ্রান্সের দাসত্ব ও গৌরব'এ দেখা যাবে নূতন চেতনা ও নির্মাণকৌশলের সার্থক সংযোগ ও সঙ্গীকরণ—ঘটনার বর্ণনা সাবলীল ইঙ্গিতময়; নাটকীয়, দুঃখময় ও হাস্যকর নানা আবেগ ও ভঙ্গীর সমাবেশে, নিপুণ চরিত্র চিত্রণে গল্পগুলি জীবনেরই সমতুল্য।

প্রগতিবাদী কথাশিল্পীর সাম্প্রতিক সমস্যা আঙ্গিক নিয়ে নয়, বাস্তব নিষ্ঠার নামে গল্পের উপাদান ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা অস্বাভাবিক বিধি নিষেধ প্রয়োগে বিপত্তি ঘটবার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে। ব্যাপক জীবন বোধ ও সামাজিক সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই কথাশিল্পকে ফর্মুলার কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। লেনিন বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে দুটি জাতীয় সংস্কৃতি' ('There are two national cultures in every

national culture')। পুঁথিগত তত্ত্ব হিসাবে একে গ্রহণ করা সহজ, এমনকি ধনতান্ত্রিক সমাজের চার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই দুই বিরোধী সংস্কৃতির নিদর্শনও প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পে উপাদান তত্ত্বের কথা নয়, গল্প যেখানে তত্ত্বপ্রধান সেখানে ঘটনা অস্বাভাবিক অথবা বর্ণহীন, চরিত্রও প্রাণহীন টাইপ মাত্র। শিল্পীর কাছে জীবনসত্য হল বিচিত্র, বহু-মুখী,—দুই বিরোধী সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাত সমাজের উপর তলা ও নীচের তলায় অসংখ্য ব্যক্তির জীবনে ও ঘটনায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রগতিশীল ছোট-গল্প যে জীবন-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার সূত্র একটাই বটে কিন্তু প্রয়োগ ও পরিচয় অসংখ্য রকমের। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন-সত্যের এই নানামুখী ধারাকে রূপায়িত করতে পারা চাই তবেই প্রগতিবাদী কথাশিল্প স্বাভাবিক সৃজনধর্ম্মী হতে পারে। জনজীবনের সঙ্গে শিল্পীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে কথাশিল্পের প্রাণস্রোত প্রবলভাবে স্পন্দিত হতে পারছে। দুই বিরোধী সংস্কৃতির বিরোধ প্রতিদিনের জীবনে, চিন্তায়, কল্পনায় ও ব্যবহারে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারা চাই, যাঁরা পারেন তাঁরাই কথাশিল্পে নূতনজীবনের উদ্বোধন করতে পারবেন। আমাদের প্রগতিশীল জীবন-বোধ এখনও অনেক পরিমাণেই বুদ্ধিগ্রাহ্য মাত্র। অনেক প্রগতিশীল ছোট গল্প লেখক উপাদানের জন্য কতকটা মন-গড়া অভিজ্ঞতা এবং কতকটা পুঁথিগত ফর্মুলার উপরে নির্ভর করে আছেন। এর কোনও সহজ প্রতীকার মূলতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেই। যে জীবনসত্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে আঘাত করছে, অতিক্রম করার চেষ্টা করছে সেই সত্যের প্রসার ও প্রভাব বাস্তব জীবনে যত ব্যাপক হবে প্রগতিবাদী কথাশিল্পীর অভিজ্ঞতা ততই সুস্থ সৃজনশীল ও সত্যনিষ্ঠ হতে পারবে।

১৩৫৮

বাংলা সাহিত্যের আপৎকাল

(১৯৪৫-১৯৫০)

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা—যুগের প্রথম পর্বে বাংলা সাহিত্যে এক অদ্ভুত অসাড়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজমানসে একদিকে ক্লান্তি ও নৈরাশ্য অন্যদিকে তেমনি আবার নতুন প্রয়াসের জন্য ব্যাকুলতা, মোহভঙ্গ, ক্রোধ, হতাশা, বিহ্বলতা, প্রতিবাদ এবং মোহ মুক্তির জোয়ার ভাঁটা চলেছে সাম্প্রতিক সাহিত্যে। কৃতী লেখকের অভাবের জন্য যে এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা মনে হয় না, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। বাঙ্গালীর জীবনে যে গভীর সংকট আজ দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে বহুবিধ কারণের সমাবেশ। এর মধ্যে কতকগুলি অতীতের জের, আর কতকগুলি কারণ মাউন্টব্যাটেন র‍্যাড্‌ক্লিফ রচিত দেশ-বিভাগের বিপর্যয় থেকে এসেছে। এ ছাড়া এমন কতকগুলি সমস্যাও আছে যা যুদ্ধোত্তর সব পুঁজিতন্ত্রী দেশেই বর্তমান। যুদ্ধপরবর্তী যুগে পৃথিবীর অন্যান্য পুঁজিতন্ত্রী দেশের সাহিত্যে যে ধরণের পশ্চাদপসরণ, পরীক্ষা, প্রচেষ্টা ও মনোবিকারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, বাংলা-সাহিত্যেও সে সবের অনুরূপ আবৃত্তি হচ্ছে। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও নীতি ও আদর্শের সংঘর্ষ সাহিত্যজগৎকে বিভক্ত করে ফেলছে।

সুদীর্ঘকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মাদনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল যাকে বলা যায় সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। কিন্তু বহু ঈপ্সিত সেই ‘স্বাধীনতা’ যখন এলো তখন তাতে রইলো না পুর্ণতার স্বাদ। শুধু দেশই নয় সেই সঙ্গে একটা গোটা সংস্কৃতিকেও টুকরো টুকরো করল ১৯৪৭এর ক্ষমতা হস্তান্তর। র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ ব্যাণ্ডেজের মত এঁটে বসল খণ্ডিত বাংলার দেহে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার দুই বিভক্ত দেহে দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি। কলকাতা

ছিল গোটা বাংলার সাহিত্যিক প্রাণ-কেন্দ্র। এখন দুই বাংলার আদানপ্রদানের সুযোগ সুবিধা ক্রমশ সংকুচিত হতে হতে বিলুপ্ত-প্রায়। কলকাতা তার বিরাট পূর্ববাংলার পশ্চাৎভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ এই পূর্বাবাংলার শস্য শ্যামল প্রান্তর এবং মাঠ ঘাট নদীর স্পর্শ-গন্ধই একদিন বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব আবেগ ও কোমলতায় মণ্ডিত করেছিল, আর তার সঙ্গে এনেছিল গ্রাম্য জন-জীবনের কিছু কিছু আভাস। এখন ঠিক এরই ঘটল অভাব। মুক্তির উল্লাসের পরিবর্তে বিভক্ত বাংলার সীমান্তের দুই দিকে বাঙালীর মনকে আচ্ছন্ন করল ফেলে-আসা গ্রাম ও নগরের স্মৃতিবিজড়িত নির্বাসন চেতনা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের উদ্দীপনা ও পতাকার সমারোহ অতি দ্রুত ম্লান হয়ে গেল। বিগত দশকের আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ ধূলিসাৎ হল। রাজনৈতিক দাসত্ব জাতির মানসিকতাকে ক্লিষ্ট করে, একথা সর্বজন বিদিত। কিন্তু আমরা আরো দেখলাম যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও কোনো কোনো অবস্থায় প্রায় অনুরূপ ভাবেই মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রশ্ন উঠেছে, বাংলা সাহিত্যের অবস্থা এখনকার চেয়ে ব্রিটিশ আমলের অন্তিমযুগে এর চেয়ে ভালো ছিল কিনা। বিশুদ্ধ সাহিত্যের পূজারী কবি ও কথাশিল্পী বুদ্ধদেব বসু ১৯৪৮ সনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,—'রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, অতএব এখন নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে আমাদের সাহিত্যে জন-সেবার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, অগভীর ফেনিলতা, এবং নাটকীয় নাকী কান্না থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।' ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য খুব জোরের সঙ্গেই করা হয়েছিল। সাহিত্যকে 'জন সেবার দায়িত্ব' থেকে মুক্ত করা খুবই সহজ তবে এর ফলে 'অগভীর ফেনিলতা', চটুল কথা সর্বস্বতা সাহিত্যকে সস্তা প্রসাধন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের প্রথম আঘাত এল তখন, যখন আমাদের লেখক ও শিল্পীরা এবং আমরা নিজেরাও দেখলাম যে, আমরা আগে যা শিখেছিলাম এখন তার অনেক কিছুই ভুলতে হচ্ছে এবং আগে

ব্রিটিশ আমলে যা উৎসাহের সঙ্গে বলেছি ও বিশ্বাস করেছি তার অনেক কিছুই ছাড়তে হচ্ছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রবীন্দ্রনাথের তিরোধান—কোনো কিছুতেই আমাদের সাহিত্যিকেরা নিরুদ্যম হননি। দুই যুদ্ধের অন্তবর্তী যুদ্ধ (১৯২১-১৯৪১) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক যুগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালেও সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণ কিছু কিছু আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছিল সাহিত্যিক আদর্শসংঘাত ও বিপর্যয়ের লক্ষণ। দুর্ভিক্ষ এবং চোরা কারবারের মধ্যে যে তীব্র শ্রেণী সত্য প্রকট হয়ে উঠেছিল তা ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রামমোহন রায়ের কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমাদের অনেক লেখক ও শিল্পীর দৃষ্টি বরাবরই ছিল নির্ভীক ও সম্মুখ-প্রসারী। ফর্ষ্টার বলেছেন—এবং তিনি খুব বাড়িয়ে বলেন নি যে—বাঙালীরা এক অসাধারণ জাতি। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য সব জাতির তুলনায় তারা অনেক বেশী আধুনিক এবং সাহসী। পরীক্ষা, নিরীক্ষা, তাদের প্রিয়, ব্যর্থতায় তারা ভেঙে পড়ে না, কারণ বিশ্বসমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের স্বভাব। স্বাধীনতা পরবর্তী এই প্রথম পাঁচ বৎসর মোটেই পরীক্ষা, নিরীক্ষার অনুকূল হয় নি। গোয়েরিং এর মত সংস্কৃতির নাম শুনলেই রিভলভার তুলে ধরবে এমন কর্তা ব্যক্তি কারো আবির্ভাব এখনো হয়নি বটে, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপরওয়ালদের মুরুব্বীয়ানার বন্দোবস্ত চালু হচ্ছে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে। বর্তমান সরকারী অভি-ভাবকদের বিচারে জাতীয় আন্দোলনের যুগের অনেক নীতি ও আদর্শ ধ্বংসাত্মক গণ্য হয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনথের কোনো কোনো আবেগপূর্ণ গানকেও বিপজ্জনক মনে করা হয়েছে। সমাজের উপর-তলাবাসিদের রক্ষকদের কাছে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের মত নাটক ও মাকি বিভীষিকার বস্তু হয়ে পড়েছিল। নীলদর্পণ নাটক হিসাবে অবশ্য বেশ একটু গরম, কারণ এতে রায়তদের দুঃখ দুর্দশা এবং নীলবিদ্রোহের সময় তাদের প্রতিরোধের কথা আছে। নতুন সমাজ-

পতিদের ইঙ্গিত অনুকরণ করতে কোন কোন খ্যাতনামা লেখকের দ্বিধা হয়নি। নতুন ফরমায়েসী সাহিত্যের চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের বিষয়বস্তুকে ঢেলে সাজিয়েছেন।

সাহিত্যজগৎ বলতে এখন আর একটিমাত্র জগৎ বোঝায় না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, বিষয় ও আবেদন নিয়ে মতের বিরোধ এর আগেও ছিল, কিন্তু সেই বিরোধ এখনকার মতো তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। প্রগতি লেখক গোষ্ঠী, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, বামপন্থী সাহিত্য সংস্থা ইত্যাদির মধ্যে ব্যবধান একেবারে মন-গড়া নয়। সমসাময়িক রাজনীতির সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ সুস্পষ্ট।

রাজনীতিতে সাহিত্য যতই দরকারী হোক না কেন, সাহিত্যের রাজনীতি সম্বন্ধে সংযম সাহিত্যিকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। প্রগতিপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সকলকেই এটা ঠেকে ঠেকে শিখতে হচ্ছে। এবিষয়ে প্রতিষ্টাবান প্রবীণ লেখক অনেকেই সাহিত্যের রাজনীতিতে রুচিবিরোধী মত্ততা প্রকাশ করেছেন সাম্প্রতিক কালে।

কোয়েসলারদের বাঙালী সংস্করণের মত ১৯৪৫ সালেই এঁরা নতুন সাহিত্যিক পরিক্রমা সুরু করেছেন এবং রোমহর্ষণ গল্প ও রাজনৈতিক কুৎসা পরিবেশন দিয়ে এঁদের এই সময়ের গল্প ও উপন্যাসে ধর্মঘট-ভাঙা দালালদের সম্মানিত বীর বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে; যাঁরাই প্রগতিশীল আদর্শ নিয়ে লড়াই করছেন তাঁদের এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেন তাঁরা হ্যামলেট, ডনজুয়ান ও আলকাপনের জগাখিচুড়ী। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এবং আরো দু এক জন সূক্ষ্ম কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের উপন্যাসে আমদানী করেছেন এমন সব রাজা, মিলমালিক, জমিদার ও মহাজন যাদের হৃদয় গান্ধীবাদের স্পর্শে বিগলিত, হাজির করেছেন এমন সব বিপ্লবীদের যাঁরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে রাজা বা মিল-মালিকদের পরিবারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেই সামাজিক সমন্বয় সহজ হয়ে গেল।

অতীতে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকেরা সকলেই একত্র

হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিভিন্ন দল ও মতের সাহিত্যিকদের ঐক্য ও মৈত্রীর মিলন-সূত্র। তিনি যে সবার উপরে 'বিরাট মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন; তিনি যে যুগপরম্পরার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মানস সম্পদ বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার মূলে ছিল জাতীয় মুক্তির জন্ত একটি মহৎ বেদনা। সমব্যথা ও সহদাসত্বের চেতনা থেকেই দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য জন্মলাভ করতে পেরেছিল। আমাদের লেখক ও শিল্পীদের মনে বিশ্বাস ছিল যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যত গলদই থাকুক না কেন তার সব কিছুর জন্য প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছে বিদেশী শাসন; অতএব বিদেশী শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ হলে আমাদের যত কিছু দুঃখ গ্লানি অন্যায় অবিচার—তার অধিকাংশই মিলিয়ে যাবে। সকলেই যে যুক্তিতর্ক দিয়ে এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন তা নয়। তবে এই বিশ্বাস ছিল সাহিত্য সাধনার আত্মিক পটভূমিকা এবং এই বিশ্বাসই গত ২০ বৎসরের বাংলা সাহিত্যে মানবতার আদর্শকে পরিপুষ্ট করেছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা—যথা যুদ্ধ, শান্তি, স্বাধীনতা, ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের লেখক ও শিল্পীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে থেকেই। অবশ্য '৪০ সালের পর সাহিত্য ক্ষেত্রে যে হিসাব নিকাশ চলল তা হল আরো অনেক বেশি চূড়ান্ত, অনেক বেশী বিস্তৃত। তৃতীয় দশকের নতুন লেখকেরাও পাঠকদের সামনে অনেক উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছিলেন। তার বেশীর ভাগ ছিল কৃত্রিম এবং ভাসা ভাসা। সাহিত্যিক ও সৌখীন আর্ট-রসিকদের মহলে চালু হালকা বিদেশী ধূয়া ছিল এ গুলির মূল প্রেরণা। চতুর্থ দশকের বাংলা-সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতার যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিল তার গুরুত্ব অনেক বেশী। এই নতুন ধারার প্রেরণাও নিশ্চয়ই অনেকখানি বিদেশ থেকে এসেছিল। তবে সাহিত্যের এই নতুন ঝোঁক কেবলমাত্র বিদেশী অনুকরণ থেকেই সৃষ্ট হয়নি, নতুন এক জীবনদর্শনই ছিল এর ভিত্তি। এর মধ্যে ছিল কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃততর করার প্রয়াস এবং গণজীবনের গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ব ও প্রকাশ

করবার চেষ্টা। এই প্রথম বাংলা সাহিত্য স্পষ্ট ভাবে তার মধ্যবিত্ত গণ্ডী ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলো, এবং সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের শ্রেণীরূপ সাহিত্যে স্বীকৃতি পেল। সমাজ জীবন স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল, ডিজ্‌রেলীর ইংলণ্ডের সেই প্রসিদ্ধ 'ধনী ও দরিদ্র' জাতি বিভাগের মতই; এর মানসিক প্রতিক্রিয়া নানাভাবে চতুর্থ দশকের বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে যে আদর্শ সংঘাত আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষ হবার আগেই তার সূত্রপাত হয়েছিল।

হাল বাংলা সাহিত্যের আবর্তে দুই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। বাঙ্গালী পাঠকেরাও আজ সমাজ-মান এবং মানসিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পুরাতন পন্থী বা প্রগতি বাদী কোনো লেখকই এখন আর বঙ্কিম, রবীন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের মত নির্বিশেষ সর্বজনীনত্বের দাবী করতে পারেন না। কারণ এমন কোনো লৌকিক আদর্শ আজ চোখে পড়ে না যা সর্বজনগ্রাহ্য। নিজ নিজ রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক লেখকই যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের চিরাচরিত ধারার মধ্যে ঘুরপাক খেতে ভালবাসেন; কেউ কেউ আবার পরিবর্তনশীল বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাল রেখে ভবিষ্যতের পথ রচনা করতে চান। কে জানে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আজ কোথায় তাঁর স্থান হতো। আমরা জানি যে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ আদর্শের প্রতিই তাঁর ছিল রুচিগত বিতৃষ্ণা। যুক্তি এবং হাস্যরসের অবতারণা করে তিনি মার্কসের দোহাই পাড়া প্রগতি সাহিত্যিকদের তত্ত্বগত উচ্ছ্বাসকে বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু সংবেদনশীল মন ও স্বচ্ছদৃষ্টি ছিল বলে তাঁর কাছে আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একরোখা আত্মম্ভরিতাও সমর্থন পায়নি। তিনি বুঝেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্যে নতুন রক্ত সঞ্চারের প্রয়োজন আছে। তিনি নিজে মাটিতে কান পেতেছিলেন সাহিত্যের সেই নব জাগরণকে স্বাগত করবার জন্য—যে জাগরণে একদিন মাটির মানুষদের চিন্তা ও অনুভূতির সার্থক রূপায়ন হবে।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমাদের সাহিত্যের কথা কল্পনাই করা যায় না। শরৎচন্দ্রের অভাব কিন্তু ঠিক রবীন্দ্রনাথের অভাবের মত অতটা তীব্র ভাবে আমরা অনুভব করি না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মধ্যবিত্ত জীবন ও মানসের যে কল্পরূপ সৃষ্টি করেছিল আমাদের বাস্তব-জগৎ ইতিমধ্যেই তা থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। শরৎচন্দ্রের ছোট-গল্প মহেশে গ্রামের গরীবদের উপর উৎপীড়নের এবং গ্রাম্য ক্ষুদে শাসকদের ধর্মের ভাঁড়ামীর একটি নিখুঁত চিত্র আমরা দেখতে পাই। মহেশকে বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের প্রভাব আমাদের যুদ্ধোত্তর উপন্যাস লেখকদের উপর খুব বেশী নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের মত কয়েকজনের শ্রেষ্ঠ রচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। সহরতলী বা কয়লাখনি অঞ্চলের নীচুতলার মানুষদের বহুবিচিত্র জীবন ও চরিত্র নিয়ে লেখা এঁদের উপন্যাস ও গল্প বাংলা সাহিত্যে যেন শেকভ্ ও গর্কির ধারা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি এনেছিল। কিন্তু এই লেখককেরা এ পথে আর বেশীদূর অগ্রসর হননি ; বরং এর পর থেকে নীচুতলার মানুষদের দুঃখদৈন্যের জীবনকে তাঁরা যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। 'কল্লোলযুগের' অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রধানতঃ যৌনসম্পর্কের রোমান্টিক ও স্বভাবাদী কথাকার ছিলেন। যুদ্ধ ও মন্বন্তরের সময় থেকে ইনি তাঁর লেখায় এক নতুন বাস্তবতার সুর সংযোগ করেছিলেন। তাঁর এই সময়ের লেখা অনেক গল্প সংবাদপত্রের রিপোর্ট ধরণের মনে হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে শ্রেষ্ঠগুলিতে মফঃস্বল জীবনের একটা নতুন দিক চিত্রিত হয়েছে। মফঃস্বল সহরে ও গ্রামাঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে নীচতা ও আত্মম্ভরিতা দেখা যায় তাকে তিনি মৃদু পরিহাসের ভঙ্গীতে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রামের গরীবদের জীবন-সংগ্রাম তাঁর কাছে অত্যন্ত নিষ্করুণ এবং নিরানন্দ বলে মনে হয়েছে। এই সংগ্রামের মধ্যে তিনি কোন আশার আলোক দেখতে পাননি ; অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদের কণ্ঠও তিনি শুনতে পাননি।

তবে তাঁর এই সব আধুনিক গল্পের মধ্যে এক নতুন রাখালিয়া (pastoral) সুরের আভাস আছে। সে সুর বামপন্থী কথাশিল্পীদের লেখায় আরও গভীর, নির্ভীক ও প্রবল হয়েছে। গ্রামজীবন সম্বন্ধে শহুরে লোকদের যেমন সব স্বপ্নালু ধারণা থাকে এ তেমন ধরণের নয়। আবার তারাশঙ্করের মতো প্রাচীন গ্রামজীবনের নষ্ট-স্বপ্নও এর মধ্যে নেই।

ক্ষয়িষ্ণু গ্রামজীবনের নিষ্করুণ সত্যকে যাঁরা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁরা, যেমন নারায়ণ গাঙ্গুলী, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক—অচিন্ত্য সেনের মতো উদ্বেগহীন পরিতৃপ্তির ভঙ্গী নেন নি।

আমাদের বামপন্থী সাহিত্যিকেরাও লেখার বাঁধুনি, রূপকল্প ও ষ্টাইল বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অস্বীকার করেন নি। নতুন লেখক ও পুরোণো লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণ ভঙ্গিমায় অনেক ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। তবুও বুদ্ধদেব বসু এবং কোনও কোনও কবির মধ্যে, তারাশঙ্কর এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অথবা মনোজ বসু এবং সুশীল জানার লেখার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মেহনতী জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে বামপন্থী লেখকদের যোগাযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে লোকসাহিত্যের অনেক বিস্মৃতপ্রায় আঙ্গিক ও আবেগের প্রতি আবার আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। অবশ্য ভদ্রলোকের রাজনীতিতে 'গণ সংযোগ' শুধু কথার কথা এবং তা একটা ফ্যাশন ছাড়া আর কিছুই নয়। তরুণ প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে এই গণ-সংযোগের উপর সত্যিই আন্তরিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং এর ফলও আশাপ্রদ হয়েছে। এই সব নতুন লেখকেরা লোকসাহিত্যের অনেক অবজ্ঞাত আঙ্গিক ও আবেগকে কবিতায়, গানে, নাটকে নতুন করে প্রয়োগ করেছেন।

সমাজবাদী বাস্তবতায় বাংলা সাহিত্যের হাতেখড়ি হয়েছিল এই শতকের তৃতীয় দশকে। পরবর্তী দশকের মাঝামঝি এই বাস্তবতার ধারা সাহিত্য হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে পাঠকশ্রেণীকে আকর্ষণ করতে

পেরেছে। সমাজবাদী বাস্তবতা এখন আর শুধু বুদ্ধিগত ভাবাদর্শমাত্র নয়। যুদ্ধ, মন্বন্তর দেশবিভাগ ইত্যাদির ফলে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী আমাদের এই সমাজব্যবস্থার বিষম বিরোধ ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নতুন সৃষ্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে প্রধানতঃ ছোটগল্প ও কবিতায়। দীর্ঘ উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু নতুন সম্ভাবনা যে দেখা যায়নি তা নয়।

কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জীবনের অনেক গদ্যময় স্তর থেকেও নিত্যনতুন আবেগ ও অনুভূতির উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমরা আশা করতে পারি যে এর থেকেই নতুন লিরিক কবিতার জন্ম হবে। জীবনের অতি সাধারণ ও বেসুরো ঘটনার মধ্যেও সমাজবাদী বাস্তবতার কবিরা বিস্ময়ের উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন। এই বিস্ময়ের উদ্বোধন স্বতঃস্ফূর্ত হলেও প্রচারকের উচ্চকণ্ঠে বিকৃত না হলে কাব্যময় প্রকাশ হয়ে ওঠে সাথক। বামপন্থী কবিরা ক্ষেতকারখানার মানুষদের দৈনন্দিন সংগ্রামকে কবিতায় রূপ দিচ্ছেন। তারই সঙ্গে ভাবীকালের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি রেখেছেন প্রসারিত এবং অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষের জীবন কথাকেও তাঁদের কাব্যের অন্তর্গত করেছেন। অবশ্য তা করতে গিয়ে অনেক সময়েই অতিস্পষ্টতা, একঘেঁয়েমি এবং পুনরুক্তি দোষ-গুলি কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ ধর্মঘট বা জলুস নিয়ে উন্মাদনাময় কবিতা রচনা করাই যথেষ্ট নয়, দেখতে হবে সেই বিশেষ ঘটনার অবসান হয়ে গেলেও কবিতাটি আমাদের স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকে কিনা এবং অনুভূতিকে নাড়া দিতে পারে কিনা, কাব্য বিচারের এইটিই সহজতম মাপকাঠি। অধিকাংশ বামপন্থী কবিতা এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে অসার্থক গণ্য হবে। সমাজবাদীবাস্তবতায়-বিশ্বাসী কবিরা ছোট ছোট গীতি-কবিতায় এবং ক্বচিৎ কোনো জোরালো গাথাতেই সত্যিকারের নতুনপথের পথিকৃৎ হতে পেরেছেন।

সমর সেন ছিলেন এঁদেরই অগ্রণী কিন্তু এখন স্তব্ধ। এককালে বুদ্ধদেব বসুর সমগোত্রীয় হয়েও কল্পনাময় আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত

কবিতার শ্লেষ-অনুপ্রাস মিশিয়ে তিনি যে নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার সম্ভবনা ছিল প্রচুর। সুভাষের কবিতায় প্রাণ-চাঞ্চল্য অনেক বেশি, আর তাঁর কবিতায় আছে সুন্দর গানের দোলা। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম সুকবি বিষ্ণু দে এলিয়ট থেকে সুরু করে এলুয়ার এবং আরাগঁর সমধর্ম্মিতায় উপনীত হবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর কবিতায় হঠাৎ চমক লাগানোর মত কিছু হয়ত নেই; তবে কবি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন, ভাবগূঢ় হলেও সর্বদাই দুর্বোধ্য নন।

আরও একজন কবির কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি হচ্ছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর সমাজচেতনাকে পৌরাণিক ও রোমান্টিক ছাঁচে ফেলবার চেষ্টায় তিনি কোনো কোনো কবিতায় আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছেন।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রগতিপন্থীদের মধ্যে সম্ভাবনার তুলনায় সার্থক সৃষ্টি তেমন বেশি চোখে পড়ে না। উপন্যাসে সমাজবাদী বাস্তবতার সূত্রগুলি উপস্থিত করা হয়ত কঠিন নয় কিন্তু রীতিমতো অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি ও অভিজ্ঞতা বা গভীরতা না থাকলে চরিত্র, প্লট এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রেণীসত্যকে জীবন্ত করে তোলা মোটেই সহজ সাধ্য নয়। কথাশিল্পের পুরানো রীতিতে সার্থক সাহিত্যিকদের তুলনায় লেখকেরা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক পিছনে রয়েছেন। এদিক দিয়ে নাম করবার মত উপন্যাস হয়ত মাত্র ৪।৫ খানি আছে—রমেশ সেনের কুরপালা, বরেন বসুর রংরুট, সমরেশ বসুর উত্তরঙ্গ, গুণময় মান্নার লখীন্দর দিগার সমাজ সচেতন সৃজন-ধর্ম্মী সাহিত্য বলে স্বীকৃতি পাবে। গোপাল হালদারের 'একদা' বাংলাসাহিত্যের সাম্প্রতিক আপৎকালের পূর্বে রচিত; এর অনন্যসাধারণ প্রকাশভঙ্গী অবশ্য আর কোনো লেখক অনুসরণ করেন নি।

এঁদের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোবিকলন ঘটিত নানা কাহিনী রচনা করবার পর যেন বুঝতে সুরু করেছেন যে, আমাদের বর্তমান সমাজটাই ব্যাধির স্বরূপ। তাঁর অধুনা-লিখিত

অনেক গল্প ও নক্সার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মূল পর্যন্ত তলিয়ে দেখবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর প্রথম কালের স্বভাব্-বাদী (naturalist) ঝোঁককেও তিনি বর্জন করেছেন বলেই মনে হয়। এখনো তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে সুসমঞ্জস বিষয় বা দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান সফল হয়নি মনে হয়।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই সমাজবাদী বাস্তবতার প্রয়োগ ও প্রকাশ সবচেয়ে সার্থক হচ্ছে মনে হয়। এর মধ্যে আজগুবি স্থানকাল চরিত্র বা ঘটনা বিশেষ নেই। অর্থকায় গুছিয়ে বলার ভঙ্গী ননী ভৌমিক সমরেশ বসু, নবেন্দু ঘোষ, সুশীল জানা এঁরা এমন চমৎকাব আয়ত্ত কবেছেন যে এঁদের গল্পে এক অদ্ভুত ঋজুতা ও ধার আমবা অনুভব করি।

অধিকাংশক্ষেত্রেই এই সব ছোট গল্পেব কাহিনী বাস্তব অভিজ্ঞতার সামগ্রী। যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার এবং আরো অন্য হাজার বকমেব ঘটনা ও তদনুরূপ চরিত্র-চিত্রণেব মধ্য দিয়ে গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই এই ধরণের গল্পে তুলে ধরা হচ্ছে। সংগ্রামী সর্বহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট, হতাশ, ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত এই লেখকদেব মধ্যস্থতায় বাংলা ছোট গল্পে এই প্রথম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পেল। গ্রাম, চা-বাগান, কারখানা, বস্তী ও শহরতলীর নীচুতলার নরকে ঘনায়মান সংকটের ছোট ছোট ছবি মনে দাগ কেটে যায়। দেখা দেয়, কিবা গ্রামে কিবা শহরে, ধীরে ধীরে মূক মানুষেরা সবাক্ হয়ে ওঠে, গোটা আকাশের রং বদলে যায়, বেরিয়ে আসে ক্ষুব্ধ নরনারী দৃপ্ত পদক্ষেপে তাদের মাথার উপরে হুমকী, অভিসম্পাত, কিন্তু দুহাতে প্রতিরোধ।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে আদর্শ সংঘাতের এইত সবে সুত্রপাত এই সংঘাত এবং দোটানার মধ্য থেকে কি যে জন্ম নেবে তা ভাবষ্যৎ-বাণী করা অসম্ভব।

পরিবর্তনশীল বাস্তবজীবনের নিশানা হিসাবে সাহিত্য দুটি কাজ করে থাকে—একটি হল বর্তমানকে প্রতিফলিত করা, দ্বিতীয়টি ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তুলে ধরা। বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান আপৎ-

কাল থেকে আমরা দুইই পেতে পারি। কোথাও ঝড়ের মেঘ ও শিলাবৃষ্টি ঘনিয়ে উঠছে, কোথাও বা মেঘভাঙা রোদের ঝিলিক-মুক্ত আকাশের স্বপ্নকে বহন করে আনছে। এই সব সন্দেহ, বেদনা ও আত্মানুসন্ধানের পরিণাম যে কি তা কোনো সমকালীন আলোচকের পক্ষে জোর করে বলা সম্ভব নয়। বর্তমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত যেমন রয়েছে প্রচুর, তেম্নি সুদীর্ঘকালের জন্য প্রতিক্রিয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবার আশঙ্কাও রয়েছে প্রবল। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যেও গৌরব আছে। বাঙালীরা আবেগপ্রবণ—এই অভিযোগ করার কোদ সার্থকতা নেই। আর কিছু না হোক, এই আবেগপ্রবণতা থেকেই তো বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ফর্ষ্টারের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে, যে বাঙালীরা একযুগের মধ্যেই যুগপৎ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ চন্দ্রের মতো দুই মনীষীর জন্ম দিতে পারে তারা নিশ্চয়ই কোনো অবস্থাকে মুখ বুজে মেনে নেবে না।

১৩৫৭

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

রীতিমত আলোচনা নয়, চলতি কয়েক বৎসরের বাংলা কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দুচারটে প্রশ্ন মনে উঠেছে; সে সব প্রশ্ন একলারও নয়, কারণ কবি, সমালোচক এবং কবিতার অনুরাগী পাঠক সকলেই ভাবছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন, কখনও কখনও সাহিত্যের আসরে তুমুল তর্ক সুরু করেছেন—কী হচ্ছে? বাংলা কবিতার কি অনাবৃষ্টির যুগ চলেছে? না অনাসৃষ্টির? হয়ত এ প্রশ্নও এখন অবান্তর হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিক আলোচনা করার সময় এখনও আসে নি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরবর্তী কালের কবি গোষ্ঠীর পরিচয় দেওয়া সহজ, কিন্তু তারও পবে যাঁরা এসেছেন, ছোট ছোট তরঙ্গের মত, তাঁদের কাব্যপ্রয়াস সম্বন্ধে সমালোচক এবং পাঠক সকলেই অনিশ্চয়তা অনুভব করেছেন। এর কারণ, সাম্প্রতিক কালেব অনেক কবিই কেবলমাত্র কবিতাই লেখেন নি, তাঁদের কবিতায় নতুন কাব্যদর্শনের অবতারণা করতে চেষ্টা করেছেন। এই সব কবিদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা করে চিহ্নিত করা দুরূহ ব্যাপার। সব কিছু মিলিয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা সম্ভব। কিন্তু সমালোচকের কাজ সহজ হত যদি সমাজচেতনার মানদণ্ডই কাব্য বিচারে চূড়ান্ত হত। সমাজ চেতনা যদি কবিকল্পনায় বাঁধাধরা রূপ নেয়, তাহলে অতি-পরিচয়ে ক্লান্তি আসে, পুনরুক্তিতে কাব্যের আবেগ ও অবিস্মরণীয়তা নষ্ট হয়। কবিতার ভালো মন্দ, ভালো লাগা বা না-লাগা কি কবির বক্তব্যের উপরই নির্ভর করবে? 'বক্তব্য' কথাটাই এমন গুরুগম্ভীর যে কবিতার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে ভাবতে ভালো লাগে না। আঙ্গিক (form) ও বিষয় (content) এ দুটীর কোনটী কার উপরে কতখানি নির্ভরশীল, এনিয়ে

বিতর্কের সীমা নেই। এই বিতর্ক অবশ্য সাম্প্রতিক কালের নয়, কাব্যের বিষয় ও রচনাভঙ্গী নিয়ে ম্যাথু আনল্ড যে সব কড়া অনুশাসন দিয়েছিলেন তার তুলনা হাল আমলের সমাজসচেতন কাব্যদর্শনেও মেলেনা।

আঙ্গিক ও বিষয়ের মধ্যে বিরোধ অনেকখানিই অবাস্তব, অন্ততঃ যদি আমরা কল্পনা-প্রধান বা আবেগ-প্রবণ সাহিত্যের প্রকৃতি বা আবেদনকে অন্য ধরণের লেখা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখি, তাহলে আঙ্গিক ও বিষয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে একথা স্বীকার করা যায় না। কবিতায় নতুন কানো বিষয় বা দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব কারো কারো কাছে রুচিকর নয়। তাঁরাই কাব্যে আঙ্গিকের সার্বভৌমত্ব দাবী করেছেন। যাঁরা এর প্রতিবাদ করেছেন তাঁরাও অল্পবিস্তর বিভ্রান্ত হয়েছেন, কবিতায় বিশেষ ধরণের বক্তব্যের মূল্য খুব বেশি করে বাড়িয়ে ধরেছেন। Poetry begins with delight and ends with wisdom এই সরল সূত্রটীতে কাব্যের দ্বৈতরূপ, দ্বিমুখী আবেদন সুন্দর ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেখানে কবিতা প্রকৃতই কাব্য-ধর্ম্মী সেখানে আঙ্গিক ও বক্তব্য, delight ও wisdon আলাদা আলাদা উপাদান হিসাবে থাকে না, কবিতার জন্মগত ঐক্য দ্বিখণ্ডিত হয় না। ধ্বনি ও চিত্র, শব্দ ও ছন্দ বিশেষ কোনো আবেগ অথবা ভাবকে আশ্রয় করে সার্থক কবিতাকে এমন একটী প্রতীকে পরিণত করে থাকে যা কোনো মতেই ল্যাবরেটরী পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায় না।

সম্প্রতিক বাংলা কবিতাতেও এমন কাব্যসৃষ্টির সার্থক উদাহরণ কিছু কিছু অবশ্যই আছে। ত্রিশ দশক থেকে সমাজসচেতন কবিদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা লক্ষ্য করেছি। সুধীন্দ্র দত্ত এবং সে সময়ের বিষ্ণু দে ছিলেন বড় বেশি ভাব গম্ভীর, অন্তরাশ্রয়ী। যেমন আমাদের মধ্যবিত্ত মনে রাজনৈতিক চেতনা ছিল নানা সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, বহু জটিল তত্ত্বের গোলক ধাঁধাঁয় বিভ্রান্ত তেমনি ত্রিশ দশকের সমাজ সচেতন কাব্য ছিল প্রায়ই পুঁথিগত প্রেরণার

ব্যাপার, আমাদের জীবনবোধের সঙ্গে বৃহৎ জনজীবনের সংযোগ ছিল অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও নানা চিত্তবিকারে দুর্বল। কাজেই প্রথম প্রচেষ্টায় আমাদের সমাজসচেতনকাব্য হয়েছিল এলিয়টি বুদ্ধিগত বিলাপের প্রতিধ্বনি অথবা তার চেয়েও ব্যর্থ কাব্য-প্রেরণাহীন ম্যানিফেস্টো। রাজনৈতিক চেতনাকে বুদ্ধিগত জ্যামিতিক ছক থেকে মুক্ত করে এনে জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে কাব্যের সহজ উদার প্রেরণায় পরিণত করতে পেরেছিল সুকান্তই প্রথম। সুকান্তের কবিতায় সমাজচেতনার যে বিদ্রোহীরূপ, সে কেবল ভঙ্গিমাত্র নয়। বহু জীবনের মিলিত সংগ্রামের মধ্যে, সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে কবিসত্তাকে মিলিয়ে দিয়ে সুকান্তই আধুনিক সমাজসচেতন কাব্যের উদ্বোধন করেছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল একদা করেছিলেন জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। সুধীন্দ্র দত্ত ও বিষ্ণু দের পরবর্তী কালে যে সব কবির প্রয়াস কিছু পরিমাণে সার্থক হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সুকান্ত ও সুভাষ, এবং বিমল ঘোষের কবি-মানসের সুনির্দ্দিষ্ট গঠন লক্ষ্য করা যায়। এদিক দিয়ে আর একজন অপূর্ব সম্ভাবনাময় কবি সমর সেন সামান্য কয়েকটী কবিতায় বিদ্যুৎ-বর্ষী শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ বাস্তবতার বিস্ময়কর পরিচয় দিয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেলেন। আরও যাঁরা লিখেছেন ও লিখছেন—হঠাৎ আশ্চর্যরকমের ভাল দুচারটী কবিতা লিখেছেন—তাঁদের নাম উল্লেখ করতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হবে। এঁদের কাব্যপ্রেরণা সম্ভবতঃ আন্তরিক, তবু এঁদের অনেকের লেখা পর পর পড়লে মনে হয় প্রগতিকাব্যের এই চেনা পথ বহুবার পরিক্রমা করেছি। রাম বসু, গোলাম কুদ্দুস, অসীম রায়, মঙ্গলাচরণ, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি সাম্প্রতিক কালের তরুণ কবিরা প্রায় একই রকম সচেতন ও সংগ্রামশীল মনোভাব নিয়ে কাব্যসৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের অনেকেরই কাব্যের ইঙ্গিতময় বৃত্ত খণ্ডিত, কখনও কখনও আবেগহীন শুষ্ক বাস্তবে কণ্টকিত। এরও ব্যতিক্রম আছে বৈকি! মাঝে মাঝে বিস্ময়কর ভাবে কয়েকটী ছত্রে, স্তবকে, চিত্রে বা ধ্বনি সমষ্টির মধ্য দিয়ে বিশেষ একটী অনুভবকে

কল্পনা ও আবেগে উজ্জীবিত করে কাব্যের নির্বিশেষ রূপ এঁরাও দিতে পেরেছেন। এখনকার অনেক কবিই সংকলনের কবি অর্থাৎ কোনও একটী বিশেষ অনুভবকে একবার কি দুবার মাত্র এঁরা কবিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন ও পারেন। মোহিতলাল, যতীন সেনগুপ্ত অথবা জীবনানন্দ দাসের মত এঁদের কাব্য প্রচেষ্টা এখনও কোনো নিজস্ব কাব্যলোক সৃষ্টি করেছে বলা চলেনা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস অথবা সাম্প্রতিক কালের বিমল ঘোষ কিছু পরিমাণে স্বকীয়তার দাবী করতে পারেন নিশ্চয়ই। অন্ততঃ সুভাষ সম্বন্ধে একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে। বিমল ঘোষের 'দক্ষিণায়ন' ও 'দ্বিপ্রহরের' চিত্রময় স্নিগ্ধ ভাব-গম্ভীর কাব্যলোক তাঁব পরবর্তীকালের উগ্র সমাজসচেতন প্রয়াসের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক ও স্থায়িত্বের গুণসম্পন্ন। উৎকৃষ্ট সমাজসচেতন কবিতায় বিদ্রোহের চড়া সুর ও ভাবী সম্ভাবনার আশ্বাস থাকতেই হবে এমন কোনো বিধান দেওয়া হাস্যকর মনে হয়। আশার বিষয়, কোনো কোনো তরুণ কবিদের মনে আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা সক্রিয় হয়েছে। প্রকৃতি ও প্রেমের পরিচিত কাব্য উপাদানের সঙ্গে সমাজ-সচেতন আবেগের মিশ্রণে এঁদের কিছু কিছু কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়। সুকান্ত-সুভাষ-কুদ্দুসের লোক-কাব্য (Public Poetry) থেকে এঁদের কাব্যলোকের প্রকৃতি ও আবেদন কিছুটা অন্য ধরণের। রাম বসু, অসীম রায় ও এঁদের মত অন্যান্য তরুণ কবিদের লিরিক ধর্মী আত্মজিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত কোথায় আশ্রয় নেবে তা' বলা কঠিন।

তাই প্রশ্ন হল, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় এই দ্বন্দ্ব নিয়ে— 'পাব্লিক পোয়েট্রি' বনাম 'পার্সন্যাল পোয়েট্রি'। সমাজসচেতন কবি 'পার্সন্যাল পোয়েট্রি' লিখবেন না, প্রকৃতি ও প্রেমের কাব্য প্রেরণাকে সমকালীন চেতনার নতুন রূপ দেবেন না, এরকম দাবী করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে।

পার্সন্যাল পোয়েট্রি' ও 'পাব্লিক পোয়েট্রি' মধ্যে তফাৎ আছে এবং থাক্‌বেই—এমন কি কাব্য সমাজসচেতন হলেও তার এই প্রকৃতি-ভেদ থাক্‌বে। ইংরাজী শব্দ দুটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি কারণ ব্যক্তিগত কাব্য এবং লৌকিক কাব্য, এই রকম নামকরণ ঠিক অর্থটি প্রকাশ করে না। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রগতিবাদী কাব্য ধারায় ঐরকম কোনো পৃথক পৃথক ভাগ করা যায় কি না। সব সার্থক কবিতাই কবিমানসের আবেগ ও কল্পনায় অনুরঞ্জিত এবং সেই হিসাবে কবিতা মাত্রেই পার্সন্যাল, অবশ্য যতক্ষণ তার প্রাণসঞ্চার করছে কবির আন্তরিক অনুভব। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু বিচার করলে পার্সন্যাল কি পাব্লিক ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় মনে হয়।

পার্সন্যাল এবং পাব্লিক—কাব্যের মোটামুটি এই দুই শ্রেণী বিভাগের সূত্র নিয়েছি ইংরেজী সাহিত্যের একজন রসবেত্তার আলোচনা থেকে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ পুনরাবিষ্কার করা গেল, রবীন্দ্রনাথও প্রায় ঐরকম শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'রামায়ণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

'মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন একশ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর একশ্রেণী কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা হয়।'

আমাদের যুগে অবশ্য ঐ দুই শ্রেণীর কবিরই রূপান্তর ঘটেছে। একলা-কবি এখন আর নিতান্ত একলা নন। যে কোনো মানুষের উপর এ যুগের দাবী হ'ল 'টোট্যাল'—রেশন থেকে 'কস্মিক' রশ্মির মারণাস্ত্র পর্যন্ত সব কিছু মিলে মানুষকে সামগ্রিকভাবে আকর্ষণ করছে। তবে 'খাঁটি' একলা কবিও আছেন যাঁরা এলিয়ট-এজরা পাউণ্ডের পথ ধরে প্রহেলিকার অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে একলা কবি বলেছেন, এঁরা সেই অর্থে কবি নন, এঁদের কাব্যে সেই ক্ষমতার স্বাক্ষর নেই যার গুণে কবিতায় 'বিশ্ব-মানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা' আপনি বেজে ওঠে।

এ যুগের মহাকাব্য হ'ল সমাজ-জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার কাব্য। এই জীবন খণ্ডিত, নানা বিরোধী শক্তির নির্মম আঘাত ও প্রতিঘাতের বেদনায় জর্জর। কাজেই আমাদের মহাকাব্যও খণ্ডকাব্য এবং কোনো কবিই মহাকবি নন, যদিও কবি-প্রতিভার নিদর্শন আমাদের যুগেও পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা কবিতার প্রাণধারা হয়ত বর্তমানে স্তিমিত। কিন্তু যাঁরা আশা করছেন রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, তাঁরা সম্ভবতঃ এই যুগের ভাব-নৈতিক সংকট সম্বন্ধে সচেতন নন। ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় টেনিসন কি ব্রাউনিং এর আবির্ভাব হয়নি প্রায় একশ বছর অন্তঃকাল পার হয়েও। তেমনি অবস্থা ফরাসী কি জার্মাণ সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ, টেনিসন, ব্রাউনিং এবং শ প্রভৃতি সাহিত্যিক দিকপালেরা যেসব যুগে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন সেগুলির সঙ্গে আমাদের যুগের মৌলিক প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের যুগে সম্ভবতঃ কোনো প্রতিভাই আর সর্বজনস্বীকৃত হতে পারবে না; কোনো শিল্পসৃষ্টিই সর্বজনীন আবেদনের ভিত্তি রচনা করতে পারবে না। তার কারণ প্রতিভার অভাব নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ আমাদের জীবনে জটিল আদর্শ সংঘাত সৃষ্টি করেছে। এমন কোনো সর্বজনীন মত-বিশ্বাস আজ নেই যা সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় ও নীচেরতলার জনসমষ্টিকে সমানভাবে প্রেরণা দিতে পারে। কাব্যেই হোক আর জীবনেই হোক, এ যুগের প্রধান লক্ষণ

হ'ল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস। ভাঙ্গা-গড়ার দ্বৈত-লীলার মধ্যে দিয়ে সমাজ-জীবনকে নতুন সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে।

বিরোধ যতদিন প্রবল ততদিন কোনো সর্বজনীন আবেগ ও কল্পনা শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য কবিমানসও খণ্ডিত। যেখানে বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে সেখানেই আগামী কালের সাহিত্যেব সর্বজনীন আবেদনের ক্ষেত্র রচিত হবে,আশা করা যায়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় এই আবেদন সৃষ্টি করবার প্রয়াস লক্ষ্য কবা যায়। এই চেষ্টা অবশ্য খুব সার্থক হচ্ছে না। অনেক রকম সাময়িক ভঙ্গী ও মুদ্রাদোষ প্রতিভার অপচয় ঘটাচ্ছে, অতিশয়োক্তি এবং বক্তৃতার ঝোঁক, গদ্যাশ্রয়ী রূঢ়তা অথবা অনুকরণপ্রবৃত্তি অনেক প্রতিভাবান কবির স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হযে আছে। তবু গৌরবের কথা বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথের পরও বাংলা কবিতার মৃত্যু ঘটেনি. অনেক ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও, নূতন উপাদান ও নির্মাণ কৌশলের সার্থক পরিচয় সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে।

সর্বজনস্বীকৃত সর্বজনীন কবির যুগ আমাদের নয়। যাঁরা বাংলা কাব্য ধারায় নতুন স্বর সংযোজন করছেন তাঁরা অধিকাংশই সংকলনের কবি অর্থাৎ 'মাইনর' কবি। হয়ত দু' একজন ভাবীকালে 'গ্রেট-মাইনরের' মর্যাদাও পাবেন। আমাদের যুগের বিচিত্র বেদনা ও বিক্ষোভের, আশা ও কল্পনার বাণীময়রূপ যদি কোথায়ও মূর্ত হয়ে থাকে তবে তা, এঁদেরই কাব্যলোকে। আমাদের মধ্যবিত্ত চেতনায় পরিচিত লিরিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে নূতন বিষয়-বস্তুকে কী অপূর্ব প্রাণ-সঞ্চার করা যায় তার নিদর্শন বিষ্ণু দে'র কাব্য-ধারায়ঃ

'হায় কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থ সারথির পরাক্রম।
বর্ণের ছায়ার মতো সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসর বিনোদনে লোটে
স্মৃতি তার কদম্ব ছায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।

তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুর মঞ্জীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি।
কার পদধ্বনি আসে ?
কার ? একি এলো যুগান্তর নব অবতার !

অথবা এর চেয়েও দৃপ্ত আশ্বাস ঃ

'প্রান্তরের অশ্বত্থের প্রাণ
উর্ধ্বমুখ, মৃত্যুঞ্জয় ভাষা
বারে বারে পায় সে ফাল্গুনে
বিপ্লবী শিকড়ে তোলে গান
মৃত্তিকার মৃত্যুহীন প্রাণ।'

এ হ'ল 'পাব্লিক পোয়েট্রি'।

আবার কবির অনুভূতি জীবনের দীনতার মূঢ়তায় পীড়িত, ব্যথাতুর, ভাবী কালের পূর্ণতর জীবনের আশায় উন্মুখ। বলিষ্ঠতার অভাব থাকলেও আবেগের তীব্রতায় কবিতার ধূয়া মনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিধ্বনিত হয়।

'কামনার রাত পাব কবে ?
কথার রূপালী হ্রদে ছোট ছোট ঢেউ তুলে তুলে
তোমাকে ভাসিয়ে দেবো
আবার বাহুতে নেবো
তোমার শরীরে নামে অরণ্যের উদ্ভিদের গন্ধ মোহ গান।'— রাম বসু

এই কাব্য-চেতনা 'পার্সন্যাল' কিন্তু ঠিক এলিয়ট-বুদ্ধদেব শ্রেণীর একলা-কাব্য নয়।

সুকান্ত ও সুভাষের কাব্যলোকে 'পাব্লিক পোয়েট্রির' ঝোঁকই বেশি, কিন্তু সার্থকও, যখন রূপকল্প ও প্রতীক বিরাট বেদনার ইঙ্গিতে প্রাণপূর্ণ।

'পেট জ্বলছে, খেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে ?
হুজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে।'

মাত্র চার লাইনে জন-মানসের ক্ষোভ ও বিদ্রোহে, বিচ্ছুরিত ক্রোধ সুভাষ ফুটিয়ে তুলেছেন।

অথবা সুকান্তের লেখায় মন্বন্তরের বিভীষিকায় দ্বিধাগ্রস্ত ব্যাকুল আবেদন,

'হে মহামার্নব একবার এস ফিরে
শুধু একবার চোখ মেল এই গ্রামনগরের ভীড়ে।'

অথবা প্রস্তুতির সঙ্গে নতুন বোধ সংযুক্ত হয়ে সুভাষের কবিতায় রূপ নিল ঃ

'পথে পথে পদশব্দ ওঠে
আকাশে নক্ষত্র ফোটে
নদী করে সম্ভাষণ, পাখী করে গান
মাঠেব সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।'

যাঁরা ধারণা করে বসে আছেন, এই ধরণের সমাজসচেতন কবিরা দেশকে ভালবাসে না, এরা বিজাতীয় ভাব ও ভঙ্গীর অন্ধ অনুকরণ করছে, তাঁরা সম্ভবতঃ সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন অথবা তাঁদের চিত্তবৃত্তি অসাড়—এমনই অসাড় যে জন-মানসের বিপুল আলোড়ন তাঁদের মনে কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি করে না। দেশ-প্রেম ও জন-জীবনের যে গভীর অনুভূতি ও বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা সাম্প্রতিক বাংলা কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতায় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ মানবিক ঐতিহ্যের কোনো বিরোধ নেই। যেমন সুভাষের কবিতায়

'এ দেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার কাছে সোনা
আমি করি তার জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।'

অথবা

'এখানে আমার পাশে
হিমাচল
কন্যা কুমারিকা
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা।'

তেমনি গোলাম কুদ্দুসের কবিতায় মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পের ঘোষণা :

'তবু বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্ত প্রহরে
ভেসে আসে নভেম্বর
ছায়া ফেলে ফেব্রুয়ারী
নৌবিদ্রোহের গুরু গুরু গর্জন
২৯শে জুলাই
নাই নাই মৃত্যু নাই।'

বাংলার কবি-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি, দুর্গতি ও বিপর্যয়ের অতল অন্ধকারের মধ্যেও তাই ফুটে ওঠে রক্তকমলের মত জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'কারার প্রার্থনা।'

আকাশ-কুন্তলা দেশ রৌদ্রস্নাত ভারতবর্ষ
কার ?
আমার।'

অথবা অপরিচয়ের যবনিকা সরিয়ে অকস্মাৎ এক তরুণ কবির কণ্ঠে স্তবের মত উচ্চারিত হয়—

এখন আমার মরা হৃদয়ের কাণে চুপি চুপি এসে
কে যেন কেবলই কথা কয়ে যায় :
তোলো না হাওয়ায়।
জলতরঙ্গ হাসির বন্যা তোলো না হওয়ায়।
দেশে প্রান্তরে হৃদয় মেলো না।
বল না জন্মভূমি যে তোমার।
তোমারই তো সেই দুর্গমগিরি
সেই দুস্তর নদী পারাবার।
পৃথিবী তোমার।
পৃথিবী তোমার।

(পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী)

১৩৫৮

বইলেখা

যে বই বিনা ভূমিকাতেই ভূমিষ্ঠ হল, তার সপক্ষে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। পাঠকেরা একথায় উৎসাহের সঙ্গে সায় দেবেন আশঙ্কা করা যায়। তবু বইলেখা হয়; পৃথিবীর শেষ বই এখনও লেখা হয়নি, পরমাণবিক বিলয় না ঘটলে সে বই লেখা হবে না। কাজেই ততদিন পর্যন্ত লেখকেরা লিখ্‌বেন, পাঠকদের অনুরাগ, বিরাগ, ঊদাসীনতা শিরোধার্য করে বই লেখা চল্‌তে থাক্‌বে আর মাঝে মাঝে হিসাব নিকাশ করা হবে, কেমন লেখা হল, কী লেখা হচ্ছে ও আরো কি লেখা যেতে পারে।

সহজ অথচ সহজ নয়ও বই লেখা। দুখানা মলাটের মধ্যে কিছু কাগজের এপিঠে ওপিঠে অক্ষরের ছাপ এইত বই। বই-এর এই স্বরূপ-বর্ণনায় ফাঁক রইল মস্ত বড়ো। তবু এটা ফাঁকির কথা নয়। পরিহাস ও গাম্ভীর্য মিশিয়ে চার্লস ল্যাম্ব বলেছিলেন, পঞ্জিকা হোক কিংবা বোর্ডে বাঁধান দাবাখেলার ছকই হোক, যা কিছু মলাটে মোড়া ছাপা জিনিষ, তা সবই বই তথা সাহিত্য। গুণী ব্যক্তির কাছ থেকে এমন উদার আশ্বাস পেলে আমরা সবাই বই লিখ্‌ব না কেন? বর্ণপরিচয় থেকে ব্রহ্মবিদ্যা, মুরগী পালন থেকে মোহমুদ্গর, বই-এর ত অন্ত নেই। ভারী সহজ কথা, কিন্তু বই লেখা সত্যিই সহজ নয়, এমন কি মুরগী পালন নিয়ে লেখাও সহজ নয়। কোনটা যে সহজ, বই পড়া না বই লেখা, তাও সব সময়ে ঠিক করে বলা কঠিন। কাগজের উপরে ছাপার অক্ষর, দেখতে ভয় পাবার মতো কিছু নয় অক্ষর জ্ঞান ও কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বই পড়ে যাওয়া যায়, কখনও তাড়াতাড়ি, কখনও ধীরে ধীরে। কিন্তু তারপর? বই ত শুধু অক্ষর, শব্দ এবং বাক্য সমষ্টি নয়। যে লেখক বই-এর পাতায় শব্দ ও বাক্য সমষ্টি সাজিয়েছেন, তিনি সম্ভবতঃ কিছু বলতে চান; কিছু বলবার না

থাকলেও অন্ততঃ বলার ভাণ করেন। তাঁর মন যদি ব্লটিং কাগজের মত সাদাও হয়—যদিও তা হয়না—তবু সেই মনের আঁচড়, কালি কলমে, ছাপার অক্ষরে, কিছু না কিছু বলবেই। লেখক যা বলতে চান পাঠকের তা মনোমত না হতে পারে; অথবা হয়ত লেখকের বলার ভঙ্গীতে পাঠক আকৃষ্ট হবেন না। তবু বই লেখা হয়, বই পড়তেও হয়। সব চেয়ে ভালো বই এবং সব চেয়ে খারাপ বই কী হতে পারে এ যদি জানা যেত, তাহলে লেখক এবং পাঠকের অনেক সুবিধা হত নিশ্চয়ই। কিন্তু বই-এর রাজত্বে এক এবং অদ্বিতীয় কিছু নেই, না ভালোর, না মন্দের।

ভালো হোক, মন্দ হোক, লেখক মাত্রেরই বোধ হয় একটা মৌলিক নিলর্জ্জতা আছে—সে হল লিখবার, নিজেকে, নিজের মতকে প্রকাশ করবার নির্লজ্জতা। এই মৌলিক গুণ বা দোষ আছে তাই বই লেখা হয়, বই লেখা ও বই পড়া মিলিয়ে সম্পূর্ণ হয় বইএর জীবন বৃত্ত। যে লেখা বক্তব্য কিংবা বাচনভঙ্গীর দিক দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক তার মধ্যেও লেখকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। নিজের কথা লেখক যদি নাও বলেন, তাঁর রুচি, অভিনিবেশ এবং অভিমতের স্বাক্ষর থাকে তাঁর লেখায়। সে স্বাক্ষর অস্পষ্ট হতে পারে, অক্ষম, অর্থহীন হতে পারে; আবার বিস্ময়কব ভাবে সার্থকও হতে পারে পাঠকের সঙ্গে সৌহার্দস্থাপনে। সহজ অথচ সহজ নয় ও; শেরিডান তাই বলেছিলেন, যা পড়া সহজ তা লেখা কী ভীষণ শক্ত!

বই-এর কিছু বলবার না থাকলেও বলার ভাণ করা যায়; আর কখনও কখনও তা' পাঠকের মন হরণ করেও থাকে। অনেক 'বেষ্ট সেলারই' স্বল্পায়ু দেখা যায়; কিন্তু হঠাৎ চমক দেবার রমণীয় গুণে তারা আরব্য রজনীর একরাত্রির সম্রাজ্ঞী। অনেকে বলতে পারেন, এই হঠাৎ চমক দেবার সফলতা সাহিত্যে সার্থক নয়, এ কেবল কথা সাজাবার চাতুর্য অথবা লোকরঞ্জনের উপযোগী বিষয় নির্বাচনের। বই লেখায় সেই চাতুর্যও সহজলভ্য নয়। আর সফলতা? গুরুগম্ভীর ব্যর্থতার চাইতে কি ভালো নয়? অবশ্য কোনো বিশেষ ধরণের জন-

প্রিয় রচনার সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তা ভাব্‌বার দরকার আছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে আপাততঃ কোনো সন্দেহ বোধ হয় ওঠেনি। আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইছে এবং তা নিয়ে কিছু জল্পনা কল্পনাও সুরু হয়েছে, আশা ও আশঙ্কার সঙ্গে।" যা নিছক সাংবাদ সাহিত্য তার সাহিত্যিক পরিপাটিত্বে মন একদিকে খুসী হচ্ছে, আবার অন্যদিকে আপত্তির সুরে গুঞ্জন করছে,

'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনো খ'নে।'

আদর্শ হিসাবে কথা সাজানোর পরিপাটিত্ব, রমণীয়তা সব সাহিত্যিক রচনারই গুণ। এ বিষয়ে সংশয় নেই। তবে আপাত-রমণীয়তার প্রতি আকর্ষণ লেখক ও পাঠকের রুচিকে নামিয়ে আনতে পারে। বীরবলী রচনাকৌশল রমণীয়, কিন্তু পাঠকের বুদ্ধিকে, অনুধাবন শক্তিকে তা ঘুম পাড়িয়ে রাখেনা। লেখার ধার বাড়াতে হলে তার ভার কমবেই এমন কোনো কথা নেই। অন্ততঃ বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সরস বুদ্ধিদীপ্ত রচনাকে আদর্শ ধবলে মনে হয় সাম্প্রতিক রমণীয় রচনায় ভার কমেছে, সহজে লোকরঞ্জনের জন্য প্রসাধন প্রীতি বেড়েছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বীরবলের দোহাই দিয়ে কারো মুখ বা কলম বন্ধ করতে চাওয়া অবশ্য অন্যায় হবে। সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সাহিত্যে অনেক নতুন ।বষয় সংযোজিত হয়েছে, যার সঙ্গে এসেছে নতুন আমেজ, নিপুণ আলাপচারী ঢং-যা কখনও কখনও সুমার্জিত কিন্তু অগভীর। প্রাত্যহিক জীবনের অনেক জিনিষ যা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় তা নিয়ে চমৎকার আলেখ্য রচিত হচ্ছে। এসব উপেক্ষা করবার মতো নয়। এরা ক্ষীণায়ু হতে পারে। কিন্তু এই ধরণের লেখার স্বচ্ছন্দগতি স্বচ্ছতা, বিষয় বৈচিত্র্য প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করছে, পাঠক সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হচ্ছে। কিন্তু তার পর? যেখানে রচনার শেষ, বই-এর শেষ, সেখানেই কৌতূহলের নিবৃত্তি। পাঠকের মনে কোনো ভাবের অনুরণন থাকছে না, যে রচনা পড়া শেষ হল, যে মলাট থেকে মলাট পর্যন্ত অবাধে

পড়ে যাওয়া ;গেল তার লিপিকুশলতা সম্বন্ধে 'চমৎকার!' 'কী সুন্দর সাজানো গোছানো কথা,' এইটুকু বলা ছাড়া ভাব্‌বার, রোমন্থন করবার কিছুই রইল না।

রমনীয়তা হল রূপ সৌষ্ঠব এবং তা কখনই তুচ্ছ করবার জিনিষ নয়। কিন্তু রূপই সব নয়, না সাহিত্যে, না জীবনে। রমনীয়তার সৃষ্টিতে যে মন রূপকে দেবে তার বিশিষ্টতা সেই মন কেবল মাত্র লোকরঞ্জনের চাতুর্য প্রয়োগে সফল হয়ে সন্তুষ্ট থাকলে সাহিত্যিক রুচির অবনতি ঘটবে আশঙ্কা হয়।

এখনকার প্রবন্ধ সাহিত্যের নতুন ফসল কেবল মাত্র রমণীয় হচ্ছে আব কিছু হচ্ছে না, এমনতর ম্যাজিষ্ট্রেটী রায় দিলেও অবশ্য আপীলে টিকবে না। হয় 'ফুলমার্ক', নয় ফেল, সাহিত্যের পরীক্ষায় এমন কোনো জবরদস্ত নিয়ম নেই। তবে যা রমনীয় তা আরো গুণান্বিত হোক, বরনীয় হোক, সাহিত্যের অনুরাগী সকলেই এটা আশা করতে পারেন। যা লোকরঞ্জক সাহিত্যিক বিচারে তা-ই সন্দেহজনক মনে কববার কারণ নেই। লেখাব বিষয় অথবা প্রকাশ-ভঙ্গী গুরু-গম্ভীর হলেই লেখা গভীর হয় না। আবার বিষয় হাল্কা হলেই লেখায় মননশীলতা থাকতে পারে না এমন কোনো স্বতঃসিদ্ধ নেই। শেষ পর্যন্ত সেই মন এবং মনের ঝোঁক, রুচি ও অনুশীলন দিয়ে ঠিক হবে কোন লেখার আবেদন ও সাহিত্যেক মূল্য কত দীর্ঘস্থায়ী। সহজ অথচ সহজ নয়ও। আমরা, যারা পেশা হিসাবে লেখক কিন্তু লেখক হিসাবে 'অ্যামেচর', তারা বিনয়ের সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে আশা করব, যে-লেখা সহজ তা আরো আন্তরিক হোক, সার্থক হোক; যে-লেখা সহজ নয় তা আরো সহজ হোক, শিক্ষিতপটুত্বে এবং দেশ-বিদেশের প্রতিভাধরদের মহৎ প্রেরণায়।

১৩৬২